দংশন

বিমল কর

[redacted] হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ সাল
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৮৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

খড়কুটো
গ্রহণ
বালিকা বধূ
পরিচয়
পূর্ণ অপূর্ণ
যদুবংশ
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন
কুশীলব
একদা কুয়াশায়
মৃত ও জীবিত
ভুবনেশ্বরী
একা একা
অসময়
সান্নিধ্য

দংশন

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। বিকেল থেকে একটানা শ্রাবণের জল ঝরে ঝরে এখন প্রায় থেমে আসার মতন; ছোট ছোট ফোঁটা বাতাসে উড়ছে. ইঁট বাঁধানো গলির রাস্তায় টিপ টিপ পড়েই চলেছে। মৃদু শব্দ হচ্ছিল। রিকশাটা গলির মুখে এসে মিলিকে নামিয়ে দিল, ভেতরে যাবে না, চাকায় বাতাস নেই, চুপসে গেছে। রিকশায় বসে বসেই মিলি ভাড়া মেটালো, তারপর রাস্তায় নামল। মাথায় ছাতা, হাতে ব্যাগ। ইঁট বাঁধানো গলির মাঝখানটা আগাগোড়াই ঢালু হয়ে এসেছে, শিরদাঁড়ার মতন গর্ত হয়ে থাকে। জল বয়ে যাচ্ছিল। পায়ের দিকের কাপড় গুটিয়ে সাবধানে পা বাড়াল মিলি। সব দিকেই জল, নোংরা। কত রকমের ময়লা ভেসে যাচ্ছে। রাস্তায় আলো না-থাকার মতন, এখনও যে কটা জ্বলছে তাদের যেন আর এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই. সর্বাঙ্গে জল মেখে অসাড়; ফ্যাকাশে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে। হলুদ, মলিন আলোর আভাটুকু বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। গলিটা একেবারে নিষ্প্রাণ, বাড়ি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, রাস্তার কুকুরগুলোও পালিয়েছে। পাড়াটা যেন সব নিঃসাড়। মিলি যতটা সম্ভব জল বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বুঝল তার পায়ের গোড়ালি জলে ডুবে আছে। গোল পুকুরের দিক থেকে ঝিঁঝিরা ডাকতে ডাকতে যেন গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে কখন। মিলি খানিকটা এগিয়েই অনুভব করল পেছনে আর-একজন লাফ মারতে মারতে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না মিলি, সে জানে কে আসছে।

বাড়ির কাছে পৌঁছে মিলি দাঁড়াল। সদরের কাছে এসে দেখল, হা... ইড়ে ওপর বাতি নিবে আছে। ... অস্পষ্ট যেটুকু ... ওখানে রেখো ... সেই আলোয় মিলি সদর দরজাটাও বন্ধ দেখল। ...

বৃষ্টি বাদলার জন্যে বন্ধ। ... তার পিঠ আলো আড়...

ততক্ষণে মিলির পিঠের কাছে পেছনের মানুষটি এ. দেওয়ালে। কান্তি রে... মুখ না ফিরিয়েই বলল, "দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।" ... একেবারে ... আড়াল ...

"কে বলল! খোলা। ভেজানো রয়েছে।"

"খোলা ?"

"খানিকটা আগে আমি এসে দেখে গেছি—" কান্তি তার ... পা ... দান সদরের মাথায় রাখল, রেখেই লাফ। সদর খোলা। দরজা হাট করে দিল কান্তি। ... "এসো; ধরছি।"

ছাতা, ব্যাগ, কাপড় সামলে মিলি কেমন করে জলটা ডিঙিয়ে যাবে ভাবছিল। কান্তি বলল, "তুলে আনব ?"

মিলি ছাতাটা বন্ধ করে বাঁ হাতে ব্যাগ আর ছাতা ধরল। ডান হাত বাড়িয়ে

বলল, "ধরো।"

কান্তি মিলির হাত ধরল। ঠাণ্ডা, ভেজা হাত কান্তির: আঙুলগুলো শ/ সিঁড়ি অন্যটা জায়গা ভিজোতে পারল না, জলের মধ্যে একটা পা ঝপ করে গেল। শাড়ি সায়া ভিজিয়ে সদরে উঠল মিলি। বিরক্ত হল।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে কান্তি বলল, "বিকেল চারটে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। দামোদরের বন্যা একেবারে।"

"আরও হবে।"

"হোক, হয়ে যাক্।"

সিঁড়িতে আলো নেই, একটা ময়লা তার মাথার ওপর ঝুলে থাকে, কোনো-দিন হয়ত বাতি ছিল, এখন আর নেই। সিঁড়ি উঠে সরু প্যাসেজ। বাঁ দিকে মিলির ঘর। ডান দিকে কোনো ভাড়াটে থাকে না। একটা মাত্র বড় ঘর। বাজারের কুণ্ডুবাবুরা ভাড়া নিয়ে মশলাপাতির গুদোম করেছে।

মিলি অন্ধকারেই ঘরের তালা খুলতে যাচ্ছিল, কান্তি ফস্ করে দেশলাই জ্বালাল।

তালা খুলল মিলি: দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অভ্যেস মতন আলোর সুইচে হাত দিল। বাতি জ্বলল না। মিলি পাশের সুইচ টিপল; ঘর সেই রকমই অন্ধকার। "কী হল?"

কান্তি ঘরে ঢুকেছে। "জ্বলছে না?"

"কই।" মিলি পর পর কয়েক বারই সুইচ নামাল, তুলল, আবার নামাল।

"পাখাটা দেখো।"

"আলো পাখা কোনোটাই জ্বলবে না," মিলি বিরক্ত, অধৈর্য গলায় বলল।

কাঠি জ্বালিয়ে কান্তি সুইচ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল।

নষ্ট হয়ে গেছে," বলতে বলতে কান্তি নিজে আলো

বল। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবে গেছে, ঘর অন্ধকার।

ছে, যা বৃষ্টি। তোমার ঘরের আলোটা প্রায়ই দেখি

দশ পনেরো দিনের মধ্যে তিনবার হল—" মিলির মুখ যা যাচ্ছিল সে চটে গিয়েছে। রুক্ষ গলায় বলল, "বাড়িআলাকে কম্নী যাবে। একটা হতচ্ছাড়া আসে, কি করে কে জানে, দুদিন এ বাড়িতে আর থাকব না। রোজ রোজ এই হয়রানি পোষায়

কান্তি বলল, "মোমবাতি জ্বালাও। আছে তো?"

"না থেকে উপায়!"

কান্তি আবার কাঠি জ্বালাল। বেশী হাতড়াতে হল না মিলিকে, দেরাজের মাথার ওপর একটা টুকরো ছিল, জ্বালিয়ে নিল। আরও কয়েকটা আছে, পাশের ঘরে। কান্তিকে অন্ধকারে রেখে আলো নিয়ে মিলি পাশের ঘরে চলে

যাবার সময় মিলির পেছনের ছায়া আরও বড়ো চওড়া দেখাচ্ছিল।

মোমের আলোর অস্পষ্ট একটু আভা ওদিকের দরজা পর্যন্ত আসছিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কান্তি বলল, "তুমি হাসপাতাল থেকে কখন বেরিয়েছ? দেরি করে?"

"সোয়া সাতটা নাগাদ," মিলি পাশের ঘর থেকে জবাব দিল।

"বৃষ্টিতে আটকে ছিলে?"

মোমবাতি খুঁজে আবার একটা জ্বালিয়েছে মিলি, দরজার দিকের ময়লা আভা এবার পরিষ্কার হয়ে উঠল।

এ ঘরে ফিরে এল মিলি। ডান হাতে নতুন বড় মোমবাতি; জ্বলছে; বাঁ হাতে আরও একটা, এখনও জ্বালায় নি। "এটা ধরো, রাখো কোথাও। জানলা-টানলাগুলো খুলে দি। ঘরটা ভেপসে রয়েছে।"

কান্তি হাত বাড়িয়ে জ্বালানো মোমবাতিটা নিল। মিলি বাঁ হাতেরটা দেরাজের ওপর ফেলে দিয়ে জানলা খুলতে গেল। জলের ছাঁটে জানলার পাট-গুলো ভিজে, খুলতে বেশ জোরই লাগল মিলির। হঠাৎ বোধ হয় তার খেয়াল হল কান্তির কথার জবাব দেওয়া হয়নি। মিলি বলল, "ডিউটি শেষ করে বেরুচ্ছি বেরুবো করছি একটা বুড়ী আমায় আটকে দিল। তাকে লেবার রুমে পাঠাতে সাতটা বেজে গেল।"

"বুড়ী?"

"তা ছাড়া কি! সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের ধুমসী। কাঁতির ব্যথা তার, চর্বিতে ফেটে যাচ্ছে। তার আবার বাচ্চা!" নাক মুখ কুঁচকে ঘৃণার সঙ্গে মিলি বলল। জানলা খুলে দেওয়ায় দমকা হাওয়া আসছিল। পাল্লার ফাঁক দিয়ে এসে মাটিতে পড়েছে। মুখ নুইয়ে দেখছিল মিলি। বিতৃষ্ণার সঙ্গে ব "রেলের বাবুদের অত বাচ্চা হয় কি করে কে জানে!" বলে দেখল, হা হড়ে দমকে মোমবাতিটা নিবে যায় যায় করছে। "না না, ওখানে রেখো না, ও নাও; ওপাশে রাখো, ওই দেওয়াল তাকটার ওপর।"

কান্তি দেওয়াল ... বাতি সরিয়ে নিল। তার পিঠ আলো আড়াল করে রেখেছে, আকৃতিহীন একটা ছায়া গিয়ে ... দেওয়ালে। কান্তি ... পিঠ সরাতেই দমকা হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কেঁপে ... একেবারে ... গেল, পলকেই যেন নিবে যাবে। কান্তি তাড়াতাড়ি বাতাস আড়াল ... বলল, "জানলা খুলে রাখলে এ বাতি থাকবে না।"

মিলি নিজেই এগিয়ে এল। "দাও, দেখি—" দেওয়াল তাকের ওপর ... মোমবাতি তুলে নিয়ে এ কোণ ও কোণ করল মিলি, ফিরে ফিরে জান... তাকাল, যেন বাতাসটা কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। শেষে দেরাজের আড়ালে একটা টুলের ওপর রাখল। বাতিটা এবার স্থিরভাবে জ্বলছিল।

মিলি বলল, "সেই এগারো বারোটা থেকে সব বন্ধ, কেমন স্যাঁতস্যাঁতানি

ভ্যাপসা ধরে গেছে ঘরে দেখছ না? হাওয়া আসুক একটু।"

কান্তি জানলার দিকে গেল। "বৃষ্টি হচ্ছে এখনও?"

"শব্দ পাচ্ছ না?"

বৃষ্টি হচ্ছিল। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কান্তি বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করে আবার ঘরে দাঁড়াল। মিলির খাটো ছায়া বেঁকো হয়ে আলনার তলায় ঢুকে যাচ্ছে যেন। ঘরে মোটামুটি দেখার মতন আলো হয়েছে, আবছাভাবে সবই চোখে পড়ে।

জানলার দিক থেকে সরে এল কান্তি। সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগল।

মিলি এবার পায়ের দিকের ভিজে শাড়ি সায়া দেখছিল। প্রায় হাঁটুর কাছে হাত রেখে পিঠ নুইয়ে কাপড় তুলে ধরেছে। পায়ের গোছ দেখা যাচ্ছিল তার। আচমকা মিলি ঘেন্নার একটা শব্দ করল, পায়ের দিকের ভেজা শাড়ির সঙ্গে কিসের যেন ময়লা জড়িয়ে আছে। প্রায় চোখের পলকে মিলি গোটা শাড়িটাই খুলে ফেলল।

কান্তি সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে।

কিছু বলার আগেই মিলি পাশের ঘর দিয়ে বাইরে চলে গেল।

বড় বড় টান দিয়ে কান্তি সিগারেট খেতে লাগল। মিলির এই ঘর বর্ষার জলে ভেজে ঠান্ডা। আলাদা কোনো গন্ধ পাচ্ছিল না কান্তি, রোজ যেমন পায়, মুশা ছোট পুরোনো বাড়ির গন্ধই তার নাকে লাগছিল, বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিজে ঘ্রাণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গায়ের জামাটা আস্তে আস্তে লাগল ও। সুতীর মোটা জামাটা বেশ ভিজে, জলে অনেকবারই ভিজেছে বিকেল থেকেই দফায় দফায় ভিজছে। অল্প অল্প ভিজতে ভিজতে জামার পিঠ, বুক, হাত সবই ভিজে গেছে।

মিলি আবার এসে গেল। ভিজে পায়ের শব্দ। পরনে শাড়ি নেই, সায়া এসেছে। হাতে একটা পুরোনো নোংরা ন্যাতা। জানলার কাছে বসে মিলি, মেঝেয় গড়িয়ে আসা বৃষ্টির জল মুছতে লাগল।

কান্তি বলল, "কী লেগেছিল ..."

"নোংরা জলো ... মরা কুকুর বেড়ালের লোম-টোম হবে।"

... না কান্তি, জামাটা খুলে একপাশে শুকোতে দিল। ...একটা জিনিস দেরাজের মাথায় আগেই রেখেছে।

"... বাড়িটায় আর মানুষ থাকতে পারে না," মিলি বলল। উবু হয়ে ব... নুইয়ে তার জল মোছা দেখলে বোঝা যায় মিলি এ কাজে অভ্যস্ত। কান্তি মিলির পিঠ, পেছন, ঘাড় দেখতে পাচ্ছিল, মুখ পাচ্ছিল না। গায়ে সাদা ব্লাউজ, পরনে সাদা সায়া। শরীরের চাপে পিঠ, পেছন কেমন ঝুড়ির মতো ফুলে রয়েছে।

"বর্ষাকালে জলে জল; বাথরুমের দিকে যাওয়া যায় না, এক গোড়ালি

জল জমে আছে, পেছোল, শ্যাওলা...” বিরক্তির গলায় মিলি বলছিল, রাগের ঝাঁঝ ফুটছে স্বরে। “ও ঘরের গোটা ছাদটাই ফুটো।”

এই ঘরটা মিলির শোওয়া-বসার। পাশের ঘরটা ঘর নয়, খুপরি। ওখানে মিলির সংসারের যাবতীয় জিনিস থাকে, খাওয়া থেকে শুরু করে ভাঁড়ার রাখা সবই হয়। তারপর এক ফালি বারান্দা, বারান্দার গায়ে হাত তিন চারেক চওড়া রান্নাঘর আর বাথরুম। কলের জল বলে কিছু নেই। সকালে ভারি এসে জল দিয়ে যায়।

কান্তি ঠাট্টা করে বলল, “তোমাদেব সরকারী হাসপাতালের নার্সদেব কোয়ার্টার দেয় না? নিয়ে নাও।”

“হ্যাঁ, দেয়; কালই নিয়ে নেব।” মিলি যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করল।

“নিচে তোমাব বাড়িআলার কোন্ বোন থাকে, তাকে বাড়ির কথা বলো।”

“অমন বোন বাড়িআলার অনেক। হাবা কালা একটা বোষ্টমী মাগী। তার ঝিটাও তেমনি।” ঘর মুছে মিলি উঠে দাঁড়াল। আধখানা ঘরই প্রায় মুছতে হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে সামান্য জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছিল। হঠাৎ হাঁচি এসে যাওয়ায় ছেলেমানুষের মতন মুখভঙ্গি কবে পর পর ক'বার হাঁচল।

কান্তি মিলির মুখেব দিকে তাকাল। মিলির চোখের মণি খানিকটা ধূসর, এখন অবশ্য এই আলোয় তা বোঝা যায় না। কান্তি হালকা গলায় বলল, “হয়ে গেল! কাল সর্দি, কাশি।”

মিলি বলল, “আমার মাথাটা সেই সন্ধ্যে থেকে ধরা-ধরা লাগছে। রেলবাবুর সেই বউটার আদিখ্যেতায় তখন থেকেই মাথা ধরে গেছে।...চা খাবে?”

“চা? এখন চা করবে?”

“কেরাসিন স্টোভে জল বসিয়ে আমি বাথরুমে যাই, কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি। তুমি চা করে নাও।”

মিলি নোংরা কাপড়টা রাখতে গেল। রেখে পাশের ঘবে কেরাসিন স্টোভ জ্বালবে। কান্তি আন্দাজ করল, এখন অন্তত সাড়ে আট। না, তেমন রাত নয়। তবে আজ এই বৃষ্টি বাদলার জন্যে অনেকটা রাত মনে হচ্ছিল। সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে, কান্তি যেন অন্যদিকে মন না দিয়ে জোবে জোরে বার কয়েক টানল, তারপর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। বাইরে এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টিও হচ্ছে পড়ছে। কান্তির মনে হল, মিলি বাথরুম যাবার আগে সে একবার ওদিকের ঘরে আসতে পারে। হাত পা ধুয়ে ফেলা দরকার, বৃষ্টির জলে জলে তার চটি তো গিয়েছেই পায়ের পাতাটাতাও ঠান্ডা হয়ে আসছে, বুড়ো আঙুলে টান লাগছে যেন। প্যান্টটাও ভিজে, অন্তত পায়ের দিকটা।

কান্তি পাশের ঘরে গেল। নীচু মতন একটা চৌকো জলচৌকির ওপর স্টোভ জ্বালিয়ে মিলি চায়ের জল চাড়িয়ে দিয়েছে। দিয়ে অন্য কি কাজ সারছিল। বাথরুমের দিকে যাবার সময় কান্তি বলল, “আজ আর বৃষ্টি আসবে না।” বলে সে বারান্দায় পা বাড়িয়ে কি মনে করে ঘাড় ঘুরিয়ে মিলির দিকে তাকাল।

ছাদের চোঁয়ানো জল টপ টপ করে বেচারীর পিঠে পড়ছে।

জলের মধ্যে ছপ ছপ শব্দ করতে করতে কান্তি বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মিলি রাত্রের খাবার-দাবার নামিয়ে একপাশে রাখছিল। তার সারাদিনের কোনো ঝি-চাকর নেই। ভারি জল দিয়ে যায়, একটা ঠিকে ঝি এসে বাসনপত্র মেজে ঘর পরিষ্কার করে দেয়। তাকে দিয়েই অর্ধেক দিন বাজার। মিলি নিজেও যে না করে তা নয়, ডিউটি থেকে ফেরার সময় করে আনে। তবে ডিউটি সব দিন সমান নয়। সকালে ডিউটি থাকলে সর্বদিকেই অসুবিধে। ভারির জল সময় মতন পাওয়া যায় না, ঠিকে ঝি নিয়ে দুর্ভোগ। সন্ধ্যে বেলায় ফিরে এসে ব্যবস্থা করতে হয় নিজেকেই। বিকেল বা রাত্রের ডিউটিতে সে অসুবিধে নেই। তবু মিলি নিজে সকালের ডিউটিটাই বেশী পছন্দ করে। রাত্রের ডিউটি তার কাছে বিভীষিকা।

খাবার-দাবার এক পাশে গুছিয়ে রাখল মিলি। বার বার স্টোভ জ্বালাবার দরকার নেই। চায়ের জল নেমে গেলে সকালের রেখে যাওয়া খাবারগুলো গরম করে নেবে। রাত্রের খাবারের জন্যে ঝঞ্ঝাটও রোজ করে না মিলি। বাইরে থেকে নিয়ে আসে মাঝে মাঝে, ইদানীং কান্তিও কোনো কোনো দিন নিয়ে আসছে।

কান্তি আসছে। তার কাশির শব্দ পেল মিলি।

"আজ বেচুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম," কান্তি ঘরে পা দিয়ে বলল।

"কি বলল?"

"বলল দাদার শ্রাদ্ধ।"

"দাদা? কোন দাদা?"

"কে জানে, পুরুলিয়ায় ওর কোন দাদা থাকে, মারা গেছে।"

"ওর নিজের শ্রাদ্ধ কবে হবে!"

কান্তি হঠাৎ জোরে হেসে উঠল।

মিলি শোবার ঘরে গেল আলনা থেকে শাড়ি সায়া জামা নিয়ে আবার এ-ঘরে এল। "চায়ের জল ফুটে এসেছে। দেখো। আমি কল থেকে আসি।" বলে মিলি অন্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ছোট টুকরোটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

কান্তি বলল, "মিছে বাতি নিয়ে যাচ্ছ, নিবে যাবে।"

"দেখি—।"

মিলি আলোটা বাঁচাতে বাঁচাতে চলে গেল।

শোবার ঘরে এল কান্তি। না, আর প্যান্টটা পরে থাকা যায় না। হাঁটু পর্যন্ত ভিজে। খুলে ফেলল। খুলে দরজার মাথায় টাঙিয়ে দিল। তলায় খুব খাটো সাদা রঙের শর্ট প্যান্ট, বোধ হয় জিনের। মাথা মুখ মুছে নিয়েছিল আগেই। চুলটা আঁচড়ে নিল।

এঘরে এসে কান্তি চা করতে বসল। সে গান জানে না, শিস দিতে জানে তবু আচমকা গানের মতন সুর করে গজলের ঢঙে কিছু গাইতে লাগল। কিসের গান কার গান সে জানে না—হতে পারে কোনো সিনেমার বা অন্য কোথাও সে

শুনেছিল। মনে নেই। কথা [illegible] সুরও নয়, ভাঙা ভাঙা দু একটা কথা অজান্তেই যেন জিবে চলে আসছে। সেই গান কখন শিস হয়ে গেল। কান্তি শিস দিতে লাগল।

চা জলে দুধ চিনি মিশিয়ে নিয়েছে কান্তি জলের মধ্যে দিয়ে, পড়িমরি করে ছুটে যেন মিলি এ ঘরে এসে পড়ল। আর একটু হলেই হোঁচট খেত। কোনো রকমে শাড়িটা অঙ্গে জড়ানো, সায়া জামা হাতে।

"কি হল?" কান্তি অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকাল।

"এক পাল আরশোলা উড়ছে বাথরুমে। বাতিটাও নিবে গেল।"

কান্তি হেসে ফেলল। 'তুমি তো তার চেয়েও জোরে উড়ে এলে।"

মিলি কোনো জবাব না দিয়ে শোবার ঘরে চলে গল। জামাটামা পরবে।

এঘর থেকে কান্তি বলল, "এখানে কি নামিয়ে রেখেছ?"

"রেখে দাও; আমি আসছি।"

"স্টোভ জ্বলবে?"

"জ্বলুক।"

কান্তি দু হাতে চা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শোবার ঘরে এসে দেরাজের মাথায় মিলির চা রাখল কান্তি। নিজের কাপে চুমুক দিল। দিয়ে আরামের শব্দ করল। "বঙ্কু বেটার চেয়ে ভাল চা হয়েছে।... আমি একটা চায়ের দোকান দিতে পারি, কি বলো?"

"কোথায়?" মিলি শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিল।

"যে কোনো জায়গায়।"

"এ শহরে নয়।"

কান্তি মিলির দিকে তাকাল। মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ, ভারী হয়ে এল তার।

শাড়ির আঁচলটা মুখের ওপর বুলিয়ে মিলি পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এল একটু পরে। ফিরে এসে চা নিল। বলল, "খাবারগুলো গরম করে নি, আবার কে স্টোভ জ্বালতে বসবে!"

কান্তি তখনও দাঁড়িয়ে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বেশ লম্বা চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা, ছিপছিপে গড়ন, হাড়গুলো চেটালো। মাথায় একরাশ চুল। লম্বাটে মুখ, নাক উঁচু, দীর্ঘ। গালের হাড় কটকট করছে। অত লম্বা চেহারার একটা মানুষের পক্ষে অতটুকু ছোট আঁট একটা প্যান্ট আর হাত কাটা গেঞ্জির দরুন আরও লম্বা দেখাচ্ছিল। কান্তির ছায়াও দীর্ঘ হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়েছে।

কয়েক ঢোঁক চা খেয়ে মিলি বিছানায় গিয়ে বসল। বসে জানলার দিকে তাকাল। এই বাতাস আর ভাল লাগছে না।

"জানলাটা এবার বন্ধ করে দাও," মিলি বলল।

কান্তি এগিয়ে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। পেছন থেকে দেখলে মনে হয় কান্তি যেন [illegible]নের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মাথায় সে অনেকটা লম্বা বলে এ

রকম হতে পারে। বা, এই ধরনের একটা ভঙ্গি [illegible] এসে গেছে। অনেক সময় মনে হয়, এটা যেন কোনো মানুষের ছুটে পালিয়ে যাবার ভঙ্গি।

মিলি বলল, "কাল আমার ছুটি। আজ যদি বৃষ্টি না ধরে না ধরুক। কাল আমি সারাদিন বাড়িতে।"

কান্তি তাকাল। তার মুখের বিষণ্ণতা পুরোপুরি কাটে নি তখনও।

মিলি বড় করে হাই তুলল। চা খেল আরও খানিকটা।

চা শেষ করে কান্তি দেরাজের কাছে এসে কাপটা রাখল। দেরাজের মাথায় নানা টুকিটাকি, মিলির ব্যাগ, কান্তির সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই আর কিছু জিনিস।

সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল কান্তি। "তুমি এখানে ক' বছর আছ?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"তিন বছর হবে," মিলি বলল।

"আমি বরাবর। জন্ম থেকে।" বলে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল কান্তি। "তুমি এই শহরকে আমার চেয়েও ভাল চিনেছ," বলে নীচু মুখে একটা সিগারেট ধরাল।

"চিনি নি?"

"চিনেছ। হাড়ে হাড়ে চিনেছ।"

মিলি শেষ চাটুকু খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। কান্তির গা ঘেঁষে দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর কান্তির রেখে দেওয়া কাপটা তুলে পাশের ঘরে চলে গেল।

ফিরে এল যখন তখন কান্তি বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে সামান্য বেঁকে শুয়ে আছে। দেরাজের ওপর দিকের ড্রয়ার খুলে মিলি তার নিজের সিগারেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট নিয়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। "আগুনটা দাও।"

কান্তি আধ-পোড়া সিগারেটটা এগিয়ে দিল। মিলি তার ঠোঁটের সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কান্তিকে তারটা ফেরত দিল। "সরো বসি।"

কান্তি পাশের দিকে সরে গেল। মিলি বসল।

"আমি যদি বদলি নি, তুমি কি করবে?" মিলি বলল।

"কে বদলি নেবে? তুমি? তোমাদের বদলি হয়?"

"হওয়ালে সবই হয়। না হলে অন্য হাসপাতালে যাব। আমি এখন সিনিয়র নার্স।"

"আচ্ছা! ভেগে পড়বে ভাবছ?"

"ভাবছি।"

"তা হলে ভেগে পড়। আমাকেও নিয়ে যেও।" কান্তি যেন পরিহাস করে বলল।

মিলি কথা বলল না। ছোট করে সিগারেটে টান দিল। কান্তির মুখ দেখছিল। "এখান থেকে কোথাও যেতে পারলে আমি একটা নার্সেস ইউনিয়ন

কিংবা নার্সেস হোম খুলতে পারতাম। পাঁচ ছ'জন নার্স থাকত।"

"সেটা কী?"

"কি আবার, নার্সদের ডেরা। দরকার মতন নার্সদের পাওয়া যায়।"

"তোমার কত টাকা আছে?"

"যা আছে তাতে খোলা যায়।"

"তাহলে খোলো। তোমার ইউনিয়নে আমায় রেখো। অফিস ক্লার্ক।" কান্তি উঠে বসল। সিগারেটটা ফেলতে হবে।

মিলি বিছানার ওপর আরও খানিকটা সরে বসে বলল, "তোমায় আমি কোন দুঃখে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াব!"

কান্তি উঠে গিয়ে সিগারেটের টুকরোটা একপাশে ফেলে দিল। হাসতে হাসতে বলল, "তোমার কাঁধে কেন, পায়ে জায়গা দিও।"

মিলি হাত কয়েক তফাত থেকে মোমের আলোয় কান্তির লম্বা চেহারা দেখছিল। লম্বা পা, বড় বড় হাত, অজস্র লোম, বাইরে থেকে ওর কোথাও নরম কিছু চোখে পড়ে না। মিলির পায়ের তলায় পড়ে থাকার মতন মানুষ ও নয়। পোষা কুকুর করে ওকে রাখা যায় না। কয়েক পলক তাকিয়ে মিলি বলল, 'তুমি যাই ভাব, আমি সত্যি সত্যি একদিন চলে যাব।"

কান্তি হাসি মুখেই বলল, "যাবে। আমিও যাব।"

"তুমি কেন যাবে? তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম?"

"কেউ কারুর সঙ্গে আসে না, কারুর সঙ্গে যায় না। এক জায়গায় কিছুদিন থাকতে হয়। ওই পাঁচ দশ বিশ বছর, ব্যাস্‌........."

মিলি বুঝতে পারল, কান্তি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে; বিশ্বাস করছে না—মিলি সত্যি সত্যি একদিন চলে যেতে পারে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল মিলি।

কান্তি আবার বিছানায় ফিরে এসে বসল। মিলি তাকাল না, কথাও বলল না। কান্তি মিলির মুখ দেখছিল। গোল ধরনের ফোলা ফোলা মুখ মিলির, চাপা নাক, সামনের দিকে ছড়ানো পুরু ঠোঁট। অথচ চোখের মণি কটা রঙের, চুলের রঙ লালচে, কপাল ছোট। মিলির চোখ মুখের কোথায় যেন রুক্ষতার ছাপ আছে। কিছুটা অগ্রাহ্যের ভাব এবং চাতুর্য।

বিছানায় শুয়ে পড়ল কান্তি, মিলির পাশে, তার পা বিছানার পাশ দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছিল। কান্তি মিলির পিঠ দেখতে পাচ্ছিল, ঘাড়, মাথা; মিলি কান্তির কোমর আর পা দেখতে পাচ্ছিল।

কান্তি বলল, "তোমার জিনিসপত্র কই?"

মিলি কোনো সাড়া দিল না।

কান্তি হাত বাড়িয়ে মিলির কোমরের কাছটা ধরল। টানল সামান্য। মিলি শক্ত হয়ে থাকল।

"তোমার কোমরের খাঁজটা খুব সুন্দর, মাটির কলসির গলার মতন। আর এত নরম, মোলায়েম......"

মিলি সামনের দিকে ঝ'ুকে পড়ল; হাত ছাড়িয়ে দিল কান্তির।

কান্তি আবার হাত বাড়াল; মিলি রুক্ষভাবে বলল, "হাত সরিয়ে নাও!"

"কেন?"

"আমি তোমার বউ নই।"

কান্তি হেসে ফেলল, "আমার কোনো বউ নেই, সবাই জানে।"

"সবাই বুঝি জানে, আমি তোমার মেয়েছেলে?"

"ভেবে আর কি!"

মিলি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল। "মেয়েছেলে রাখার ক্ষমতা তোমার আছে?"

কান্তি শুয়ে শুয়ে মিলিকে দেখছিল। মাথা নাড়ল এ-পাশ ও-পাশ। "নেই। এখন আমার কিছু নেই।"

"তবে?"

কান্তি কোনো কিছু বলল না, চুপ করে শুয়ে থাকল। তার মুখ দেখে মনে হল না সে উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ। শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল।

মিলি সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিয়ে দেরাজের কাছে চলে গেল। তলার দিকের ড্রয়ার টেনে কিছু জিনিসপত্র বের করল। ইনজেকসানের সিরিঞ্জ ছ'ুচ, সামান্য তুলো। একটা অ্যামপুল।

কান্তি বলল, "তুমি তো বলো, আমি তোমার পোষা কুকুর।"

"হ্যাঁ, বলি।"

"তাই ব'লো।"

মিলি আরও চটে গেল। বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি শুধু কুকুর নও, ... শয়তান, হাড় শয়তান।"

কান্তি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না, যেন কৌতুক অনুভব করেছে, খাটের পাশে ঝোলানো ডান পা আস্তে আস্তে তুলে মাথার দিকে আনতে লাগল, মনে হবে ব্যায়াম করছে, কিংবা খেলা। উঁচু গলায় বলল, "সকলেই জানে। এই শহরের সকলেই জানে কান্তি মজুমদার একটা পাক্কা শয়তান। তুমি শালা ইংরিজী জানো না, জানলে বলতে ডেভিল। বেচুবাবুরা বলে, ডেভিল। পারিজাত আমাকে বলছিল, আমি পারফেক্ট ইভিল।" ডান পা নামিয়ে কান্তি এবার বাঁ পা আগের মতনই তুলতে লাগল আস্তে আস্তে।

মিলি আর দাঁড়াল না, পাশের ঘরে চলে গেল। কেরাসিন স্টোভটা আগেই নিবিয়ে দিয়ে গেছে সে। খাবার দাবার গরম করে একপাশে রাখা আছে। খান কয়েক রুটি, ডিমের তরকারি, খানিকটা ডাল। ঘরটার পুরো ছাদ চু'ইয়ে জল পড়ছে, কোথাও কোনো হাঁড়িকুড়ির মাথায় জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছিল। বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ। বৃষ্টি হয়ত থেমেছে, বুঝতে পারছিল না মিলি।

মিটসেফের ওপর ছোট স্পিরিট স্টোভ। মিলি স্পিরিট স্টোভটা জ্বালিয়ে নিল। অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা ছোট একটা বাটিতে জল দিয়ে স্টোভের ওপর

বাটিটা চাপিয়ে বড় করে নিশ্বাস ফেলল মিলি। এ রকম কেন হয় সে জানে না, বুঝতে পারে না, কান্তির ওপর হঠাৎ তার বিশ্রী এক আক্রোশ ধরে যায়, ঘৃণা হয়। মাথায় দপ করে রাগ উঠে যাবার পর ওই কান্তিকে আর চোখের সামনে দেখতে ইচ্ছে করে না, ওকে দেখলেই গা রিরি করে, চোখ জ্বালা করতে থাকে, মাথার মধ্যে রক্ত যেন ছলকে উঠে হুঁশ নষ্ট করে দেয়। তখন লোকটাকে রাস্তার কুকুরের চেয়েও ঘেন্না হয়। ইচ্ছে করে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় জন্তুটাকে। কান্তিকে এ-সময় কতো যে খারাপ, নোংরা, কুচ্ছিত লাগে মিলি কোনোদিন বলে বোঝাতে পারবে না। একবার এই রকম রাগের সময় মিলি কান্তিকে কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল, কপালে বা কানের পাশে রগে না লেগে গ্লাসটা কান্তির চোয়ালের হাড়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সারা ঘরে কাচ, কান্তির গাল দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়ুচ্ছে। মিলির তাতেও হুঁশ নেই গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল। নিজের পা কাচের টুকরোয় কেটে যাবার পর হুঁশ এল।

মিলি দেখেছে, সে যখন রেগে যায়, মাথা গরম করে, কান্তি তখন এমন ঠান্ডা, হাসি হাসি, হাবার মতন মুখ করে থাকে যেন মিলির রাগে তার গা নেই। তাতে মিলির রাগ আরও চড়ে যায়, মাথা দপদপ করতে থাকে। যার কথা বলার, চেঁচাবার, হিংস্র হবার ষোলো আনা ক্ষমতা রয়েছে সে বোবার মতন চুপ করে থেকে শয়তানি করলে গা জ্বলে যাবে না তো কি হবে! মিলিকে খুঁচিয়ে রাগিয়ে দেবার জন্যেই যেন কান্তি প্রথমটায় ওই রকম করে। এতে তার কী সুখ মিলি বুঝতে পারে না।

জল গরম হয়ে আসছিল। আঙুলের ডগা ডুবিয়ে মিলি জলের উষ্ণতা দেখে নিল, তারপর এক এক করে ইনজেকসানের সিরিঞ্জ টিরিঞ্জ জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

এই ঘরের কোথাও কোনো পাত্র ছিল, ছাদের চোয়ানো জলে ভর্তি হয়ে গেছে, তার ওপর জলের ফোঁটা পড়ে শব্দ হচ্ছে, টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ : একই রকম শব্দ, একই রকম সময়ের ব্যবধানে। শব্দটা মিলি এতোক্ষণে স্পষ্ট করে শুনতে পেল যেন, শুনতে শুনতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আর বৃষ্টি দেখবার চেষ্টা করল। বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, ভিজে বাতাস বয়ে যাচ্ছে হুহু করে, আর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কান্তি বিছানার ওপর উঠে বসেছে অনেকক্ষণ। মিলি আবার শোবার ঘরে ফিরে এসে ক্যাম্বিসের চেয়ারে গা ডুবিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল। হাই তুলল কান্তি, হাত দুটো দু পাশে ছড়িয়ে আলস্য ভাঙল। রাত হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল সে। মিলির দিকে তাকাল। মিলি চোখ বুজে শুয়ে আছে। মোমবাতির আলোয় বেশ নরম দেখাচ্ছিল মিলিকে। হালকা রঙের শাড়ি, পাতলা জামা, হাত দুটো কোলের ওপর রাখা। কান্তি যেন মিলিকে সচেতন

কান্নার জন্যে শব্দ করে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর দেরাজের কাছে গিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। ঘরে পাখা চলছে না, তবু গরম লাগছিল না কান্তির। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অন্য-মনস্কভাবে ঘরের চারদিক তাকাতে লাগল।

মিলির এই ঘর মোটামুটি। তার একার পক্ষে যথেষ্ট। দেওয়াল ঘেঁষে একপাশে পুরোনো খাটে বিছানা, একটা পুরোনো আমলের দেরাজ এ পাশে, দুটো বাক্স আর সুটকেশ একটা বিছানার পায়ের দিকে, কাপড় জামা রাখার সস্তা আলনা। আসবাব বলতে আর বিশেষ কিছু নেই, কাঠের একটা চেয়ার, ছোট মতন সস্তা একটা টেবিল, মোড়া একটা। ক্যাম্বিসের চেয়ারটা মিলির নয়, কান্তি এনে দিয়েছিল একদিন। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটাও কান্তির যোগাড় করা। কোথাও কোনো ছবি নেই, একটা মাত্র ছোট, প্রায়-অস্পষ্ট পুরোনো ছবি, চোখেই পড়ে না, মাথার ওপর একদিকে ঝুলছে। মিলির পিসিমার ছবি।

দেরাজের মাথায় রাখা ছোট টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকাল কান্তি। পৌনে দশ। আর যেন সহ্য হচ্ছিল না। হাত বাড়িয়ে কান্তি মিলির রেখে দেওয়া ইনজেকসানের অ্যাম্পুলটা উঠিয়ে নিল। পেথিডিন। কান্তির হাত, আঙুল সব যেন কেমন কাতর হয়ে এল। নরম করে ঘাঁটাঘাঁটি করল। গালে ঠেকাল।

চোখের পাতা খুলে তাকাল মিলি। সরাসরি কান্তির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কান্তি লোভীর মতন হাসল। বলল, "দশটা বাজে।"

মিলি বলল, "রেখে দাও।"

বাধ্য বালকের মতন কান্তি পেথিডিনের অ্যাম্পুল রেখে দিল।

"তুমি আজ বড় রাত করছ," কান্তি ধীরে ধীরে মিলির কাছে সরে এল।

মিলি বলল, "আগে খেয়ে নাও।"

"তুমি খাও, আমার......"

"আমার পয়সা সস্তা নয়। তোমার খাবারগুলো কি রাস্তায় ফেলে দেব?"

কান্তি রাগ করল না। "এসো, তোমায় তুলে দি।"

মিলি কিছু বলার আগেই কান্তি হাত বাড়িয়ে মিলির হাত ধরল, তারপর টেনে তুলে নিল। নিয়ে মিলিকে গায়ের পাশে রাখল, একটা হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। "আমি একদিন তোমাকেই খেয়ে ফেলব।"

মিলি বলল, "আমাকে আর কত খাবে!" বলে সে কান্তির হাত ছাড়াবার সময় অনুভব করল, কান্তির হাত যেন সামান্য কাঁপছে। কেন কাঁপছে মিলি বুঝতে পারল। মিলির জন্যে নয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কান্তি তার ছোট, আঁটোসাঁটো প্যান্টটা পালটে নিয়েছে। পাজামা পরেছে। ক্যাম্বিসের চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। পাশের ঘর অন্ধকার, বারান্দার দিকের দরজায় ছিটকিনি তোলা।

বাইরে আবার ঝাপটা মেরে বৃষ্টি নেমেছে।

মিলি স্টেরিলাইজ করা ইনজেক্সানের সিরিঞ্জ গুছিয়ে নিচ্ছিল। মোমবাতিটা এখন দেওয়াল তাকের ওপর, শিখা কাঁপছে না। আলোর কাছে দাঁড়িয়ে সিরিঞ্জটা আরও একবার দেখে নিল মিলি, নিয়ে কান্তির দিকে তাকাল। কান্তি অধৈর্য, কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। এই সময় কান্তি যেভাবে গলা উঁচু করে, লোভীর মতন তাকিয়ে থাকে তাতে মিলির মনে হয়, এক টুকরো রুটি হাতে করে রাস্তার সবচেয়ে ক্ষুধার্ত, লোভী কুকুরের সামনে দাঁড়ালে কুকুরটাও অবিকল ওইভাবে তাকিয়ে থাকবে। কান্তির এই মুখ মিলির চেনা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই রকমই হয়। নতুন নেশা কেমন ধরে আসছে মিলি বেশ দেখতে পাচ্ছে। দেখতে তার ভালই লাগে, কেমন যেন এক আনন্দ হয়, হয়ত নিষ্ঠুর কোনো আনন্দ। কেমন আনন্দ তা নিয়ে মিলি মাথা ঘামাতে চায় না।

পেথিডিনের অ্যাম্পুলটা তুলে নিল মিলি।

কান্তি যেন সঙ্গে সঙ্গে পিঠ উঁচু করে বসল।

মোমবাতির আলো পড়ছিল মিলির হাতে মুখে। স্থূল ছায়াটা আলনা মাথায় গিয়ে পড়েছে, স্পষ্ট কোনো চেহারা নেই। কাঁচ ভাঙার টুক্ করে মৃদু শব্দ হল, অ্যাম্পুলের মুখ ভাঙল মিলি।

কান্তি বলল, "আমাকে একটু বেশী দিও; আজ আমার দিন খারাপ।"

মিলি কোনোদিকে তাকাল না, অ্যাম্পুলের মধ্যে সিরিঞ্জ ডুবিয়ে অত্যন্ত হাতে পেথিডিন ভরে নিচ্ছিল। কান্তির কথায় সে কান করল না। [illegible] ওই লোকটা কোনো নেশা করে নি একথা মিলি বিশ্বাস করে না। এ রকম ব[illegible] বাদলায় কিছু না খেয়ে বসে থাকার মানুষ ও নয়।

এক টুকরো তুলো নিল মিলি। রেক্টিফাইড স্পিরিট ফুরিয়ে গিয়েছে। দু[illegible] ফোঁটা হয়ত ছিল। তুলোটা ভিজল কি ভিজল না, মিলি সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে গেল। কান্তি চেয়ারের ওপর পিঠ সোজা করে বসে পড়েছে, হাত এগিয়ে দিল। মিলি সামনে এসে কান্তির দিকে তাকাল। এখন অবস্থাটা, মিলির মনে হল, ভীষণ, ভীষণ অবস্থা। জিব বারকরা জন্তুর মতন লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা, আর মিলি যেন তার মুখের ওপর এক টুকরো মাংস ঝুলিয়ে রেখেছে। খেপার মতন চোখ কান্তির, অসম্ভব অধৈর্য। যদি হঠাৎ মিলি হাতটা সরিয়ে নেয়, কিংবা হাত থেকে সিরিঞ্জটা ফেলে দেয়, ওই লোকটা কী করবে মিলি তা জানে। বুনো পাগলা শেয়াল কুকুরের মতন তার ওপর লাফিয়ে পড়বে, খুন করে ফেলবে মিলিকে। কোনো সন্দেহ নেই মিলিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে, আঁচড়ে কামড়ে মেরে ফেলবে।

তুলো দিয়ে কান্তির হাতের একটা জায়গা মুছে নিল মিলি, কোনো রকম যেন যত্ন নেই, স্বাভাবিক অভ্যাস এবং পেশাদারী দক্ষতা রয়েছে।

"আজ একটু চড়িয়ে দাও," কান্তি অনুনয় করে বলল।

মিলি কোনো জবাব দিল না, ছুঁচের মুখটা কান্তির হাতের মাংসে ফুটিয়ে

দিল। তার বেশ লাগল, ভাল লাগল। কোনোদিন এমনও হতে পারে মিলি সমস্ত ছু*চটাই কান্তির মাংস, শিরা, উপশিরার মধ্যে দিয়ে কোথায় যে ঢুকিয়ে দেবে সে নিজেই জানে না। মিলি জানে না, কান্তির ওই রক্ত-মাংসের ভেতরে, অনেক ভেতরে এমন কোন অন্ধকার আছে যা সে স্পর্শ করতে চায়, যা মিলিকে খুবই তৃপ্ত করবে।

চোখের দৃষ্টি একেবারে স্থির, একটুও নড়ছিল না। মিলি সিরিঞ্জ তুলে নিল।

কান্তি ডান হাত বাড়িয়ে মিলিকে ধরতে গেল। "আর একটু দাও।"

'না।"

"দাও মাইরি, দিয়ে দাও।"

কা।

"কাপড় ছেড়ে দাও।"

করা।

"দেবে না?"

চোখেই

"দু'বার দিয়েছি।......এ রকম করলে তুমি আর এখানে আসবে না।"

শাড়ি ছেলে দিল কান্তি।

মিলি সামান্য তফাতে সরে গেল; সরে গিয়ে একটা বেতের মোড়ার ওপর পা রাখল। কান্তি দেখছিল।

বাঁ দিকের পায়ের শাড়ির ঊরু পর্যন্ত তুলে ফেলল মিলি। হাতের তুলোটা হাঁটুর অনেকটা ওপরে ঊরুতে, মাংসের ওপর সামান্য ঘষে নিল। তারপর সিরিঞ্জের ছু*চটা ডুবিয়ে দিল। ঘৃণার চোখে দেখছিল কান্তি। মিলি নিজের ভাগ থেকে এক বিন্দুও কমায়নি। শক্ত, ফোলা ফোলা, সুগড়ন মাংসের মধ্যে মিলি তার ভাগের সবটুকু নিয়ে নিল। কান্তি বুঝতে পারল না, মিলি তাকে ঠকায় কি না! কান্তিকে খুবই কম দেয়, নিজে বেশী নিয়ে নেয়!

মিলি দেওয়াল তাকের কাছে চলে গেল। ছু*চ, সিরিঞ্জ আলাদা করল।

সিগারেটের টুকরোটা মেঝেয় ফেলে দিল কান্তি। পা দিয়ে নিবিয়ে দিল।

আকাশ-বাতাস ঘটা করে নেমেছে আবার; জলের ছাঁট আছড়ে পড়ছিল জানলার পাটে। কতক্ষণ বৃষ্টি হবে কে জানে। হয়ত সারা রাত।

মিলি হাতের কাজ শেষ করল। কান্তি একেবারে চুপচাপ। বাতিটা ফু* দিয়ে নিবিয়ে মিলি অন্ধকারে বিছানার দিকে চলে গেল।

দুই

অন্ধকারে শুয়ে থাকতে থাকতে কান্তি হঠাৎ হাসল। মিলি সোজা হয়ে শুয়ে ছিল, চোখের পাতা বুজে। হাসি শোনার পর পাতা খুলে তাকাল ঘোর অন্ধকার, জানলা দরজা সবই বন্ধ, কোনো রকম আলো আসছে না, কান্তিকেও সে দেখতে পাচ্ছে না, অনুভব করতে পারছে মাত্র, পাশেই কান্তি। বালিশের ওপর মাথাটাকে ফেরালো মিলি, যদি কান্তিকে দেখা যায়। নজর করে দেখলে, ছায়ার মতন দেখা যায় কান্তিকে।

মিলি বলল, "পাখাটা যদি চলত .." বলে শাড়ির আঁচলে গলার কাছটা একটু বাতাস করল।

"গরম লাগছে?"

"সব বন্ধ।"

"ওতে কিছু হবে না।"

মিলি কোনো কথা বলল না। এত বৃষ্টির মধ্যে তার গরম লাগার কথা নয়, তবু একটু বাতাস কোনো দিক থেকে আসছে, কোনো ফাঁক দিয়ে কোনো রকম আলোর আভা, ভাবতে পারলে ভাল লাগত।

কান্তি বলল, "আজ দুপুর বেলায় একটা সাধু আমার হাত দেখেছে।" কান্তির গলায় হাসি।

"কোথায়, মদের দোকানে?"

"তারকের দোকানের গদিতে বসে।" কান্তি যেন বোঝাতে চাইল, ব্যাপারটা ফেলনা নয়।

"কী বলল?"

কান্তি আবার হাসল। বলল, "আমি বহুত কামাবো, খাবো, পিবো .."

"তুমি কি বললে?"

"আমি বললাম, সাদি হোবে?" কান্তি হিন্দী ভঙ্গিতে তামাশা করে বলল। "বেটা বলল, জরুর; সাদি হোবে, বালবাচ্চা হোবে।"

মিলি বলল, "আহা, ষোলো আনা সুখ।"

কান্তি যেন হালকাভাবে হাসতে হাসতে মিলির দিকে পাশ ফিরল। "সাধুদের কথা লেগে যায়, ঝাট্ করে লেগে যায়।"

"লাগুক।"

কান্তি ক্রমশই আরাম বোধ করতে শুরু করছিল। এ আরাম চমৎকার লাগে. ভারহীন, চাপহীন।

হাই তুলল কান্তি, জড়ানো হাই। চুপ করে থাকল সামান্য। তারপর হাত বাড়িয়ে মিলির গাল খুঁজে নিয়ে আস্তে আস্তে আদর করার মতন চাপড়াতে লাগল। মিলি কোনো আপত্তি করল না।

"মিলি, আমার এখন বিয়ে বিয়ে লাগছে," কান্তি সরলভাবে হাসল, "তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকলে তোমাকে বউয়ের মতন লাগে।"

মিলি কান্তির হাত গালের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমার লাগে না।"

"তোমারও লাগে।"

"না; লাগে না।"

"কী লাগে তোমার?"

মিলি কোনো জবাব দিল না। তার ঝিম ধরে আসছে। এই অন্ধকারে, বাইরে ঝমঝম বৃষ্টিতে চমৎকার আলস্য, গাছাড়া নিশ্চিন্ত ভাব এসে যাচ্ছে।

"মিলি? এই মিলি? কী লাগে তোমার?"

"জানি না।"

"তুমি তোমার কথা জানো না।"

মিলি জবাব দিল না কথার। কথা বলতে তার ইচ্ছে করছিল না।

কান্তি আবার হাত বাড়াল। মিলির পিঠের ওপর। টানল। "তোমার নাম মিলি, মিলি মণ্ডল। মিলন নাম ছিল তোমার, মিলনমালা। মালা না বালা? শালা. চিনির মতন নাম। কে তোমায় মিলু বলত?"

মিলি কান্তির পেটের কাছে আঁট হয়ে গিয়েছিল। কান্তির পা তার কোমর এবং পেছনের ওপর দিয়ে জড়ানো। বুকে চাপ লাগছিল মিলির। কান্তি আন্দাজে খেলা করার মতন কয়েকটা চুমু খেল মিলিকে।

ঘুম পাচ্ছিল মিলির। জড়ানো গলায় বলল, "আমায় অত জড়িয়ো না।"

"কেন?"

"ভাল লাগে না।"

"আমাকে খারাপ লাগে?"

"না।"

"তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। তুমি তোমাকে দেখতে পাও না। পাও? মানুষ নিজেকে পুরো দেখতে পায় না। ধরো, একটা আয়নার সামনে তুমি একা দাঁড়ালে। বড় আয়না, বিরাট আয়না, আমাদের বাড়িতে বাবার ঘরে যেমন ছিল। আমার বাবার ঘর তুমি দেখো নি। ওই রকম একটা আয়নার সামনে.. । আমি কী বললাম? বাবা? উঁহু, বাবা নয়; শচীনবাবু, শচীন লাট।"

মিলি যেন ঘুম চোখে কান্তির ঠোঁটের চারপাশ জিব দিয়ে চেটে নিল। মনে হল, ঘুমের ঘোরে তৃষ্ণায় ঠোঁট ভিজিয়ে নিল।

কান্তি বলল, "যাঃ শালা, লাট কি! মজুমদার। শচীন মজুমদার..." টেনে

টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে কান্তি বলছিল, "আয়নার কথা বলছিলাম। বিরাট আয়নার সামনে তুমি একলা গিয়ে দাঁড়ালে। একেবারে ন্যাংটো। নিজেকে দেখো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো, শুধু নিজের সামনেটাই দেখতে পাবে। তোমার পেছনটা কোথায়? পিঠ, ঘাড়, শিরদাঁড়া, পেছন, পায়ের ভেতর দিকের গোছ? উঁহু, দেখতে পাবে না। তুমি পেছনে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়াবে? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে? উঁহু, তাও ভাল দেখতে পাবে না। তাছাড়া তোমাব সামনেটা কেমন করে দেখবে, পেছনে ঘাড় ঘুবিয়ে সামনে দেখা যায় না।"

মিলি ঘুমিয়ে পড়ল।

বিড় বিড় কবে কান্তি বলল, "মানুষ নিজেকে সবটা দেখতে পায় না, কখনো নয়, কোনো সিচুয়েশানে নয়। আমি তোমায় দেখতে পাই। তুমি আমাকে পাও।"

কোনো রকম সাড়াশব্দ ছিল না মিলির, নেশার ঘোরে শিথিল নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কান্তিব চোখ জড়িয়ে এসেছিল। পাতা বুজে যাচ্ছিল। মিলির বুকে আঙুলের খোঁচা মেবে কান্তি ডাকল, "এই মিলি? মিলি?"

নিশ্বাস পড়ছিল মিলিব, ধীর নিশ্বাস, যেন ছন্দে বাঁধা।

কান্তি চোখ বুজে অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত একইভাবে শুয়ে থাকল, তারপব ঠেলে সরিয়ে দিল মিলিকে। মিলির মুখের গন্ধ তার নাকে লেগে আছে, তার জিবের লালা তখনও ঠোঁটের ওপর ভিজে ভিজে লাগছিল।

ঘুমের হালকা ঢেউ যেন কান্তির চেতনার ওপর পর পর ভেঙে পড়ার পর একেবারে স্থির, শান্ত হয়ে গেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে তার হাত, পা, কোনো প্রত্যঙ্গই আর নড়ছিল না, শুধু নিশ্বাস পড়ছিল নিয়মিত, ভারী নিশ্বাস।

গলার ওপর হাত পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল কান্তির। সে চমকে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি গলার কাছের হাতটা ধরে ফেলল। ধরেই বুঝল, মিলির হাত। হাতটা সরিয়ে দিল কান্তি। তার গলায় আচমকা কোনো হাত পড়লে সে চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে যায়, অন্তত এই সব সময় যখন সে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, সজ্ঞান নয়।

মিলির মুখ দিয়ে যেন অঘোর ঘুমের গন্ধ আসছিল, পেট বুক গলা জিব—সব জায়গা থেকে গন্ধ উঠে মিলির নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মিলি ঘুমিয়ে পড়লে তার ঠোঁট খুলে মুখ হাঁ হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে কেমন শব্দও করে ওঠে গলায়, যেন তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে, দম বন্ধ হযে গেল। কান্তি ঐ ধরনের শব্দও সহ্য করতে পারে না, কখনও কখনও সে চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে যায়। নিজের গলা সম্পর্কে ভয় বাড়তে বাড়তে হয়ত অন্যের গলার অদ্ভুত শব্দও তাকে ভীত করে। মিলির দিকে পিঠ করে পাশ ফিরল কান্তি, যেন নিজের গলা সরিয়ে নিল।

গভীর ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কান্তির। অন্ধকার ঘরে বোঝা যাচ্ছিল না এখন কত রাত। শেষ রাত হতে পারে, কেননা নেশার আচ্ছন্নতা আর তেমন নেই। কান পেতেও কান্তি বৃষ্টির কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না। অথচ সে পুরোপুরি সজ্ঞান নয়, ঘুম এবং জাগরণের মধ্যে রয়েছে, কখনও ঘুমিয়ে পড়ছে, কখনো পাতলা ঘুমের মধ্যে তার চেতনা অস্পষ্ট ভাবে জেগে উঠছে।

ওই অবস্থায় আরও কিছু সময় কেটে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল কান্তি, আবার জাগল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আবার যখন জাগল তখন তার চেতনা আবছা, অস্পষ্ট, ভীষণ এক মেঘলার মধ্যে মরা আলোর মতন বিষণ্ণ, ভার হয়ে আছে।

এই অবস্থায় কান্তি নিজেকে দেখতে পেল। যেন তাদের দোতলার ঘর থেকে নেমে আসছে তর তর করে, নীচে নেমে এল, নিজের ঘরে, তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ মারতে মারতে ওপরে উঠে গেল। আবার যখন নেমে এল তখন সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে, তিন-চারটে সিঁড়ি একসঙ্গে লাফ মারল, পড়ে গেল, উঠে দাঁড়াল, আবার ছুটল, তারপর পালিয়ে গেল।

পালিয়ে গিয়েও কান্তি আবার ধরা পড়ল। কে যেন তার পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়েছে, চমকে ঘুরে দাঁড়াল কান্তি। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে আর নড়ল না, পালাল না।

পালাবার কোনো যেন দরকারই নেই, পরম নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কান্তি বলল: হ্যাঁ, আমি কান্তি। কান্তি মজুমদার। শচীন মজুমদারের ছেলে। আমার বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ। এই শহরের ছেলে আমি। আমার বাড়ি এখানেই। আমার বাবা শচীন মজুমদার কালীতলার দিকে পুরোনো বাড়ি বেচে দিয়ে ময়ূরাবাগানে নতুন বাড়ি করেছে, এই বছর তিন চার হল। দেদার পয়সা খরচ করে বাড়িটা করা, স্যার; দেওয়ালে টোকা মারলে টং করে আওয়াজ উঠবে। নায়ার কোম্পানীর এক নম্বরের ইঁট, কলকাতার কোন হরিসাধন—গ্রেট আর্কিটেক্টের প্ল্যানফ্যান; আসল সিমেণ্ট, টন টন লোহা, ফার্স্ট ক্লাস চুন, রঙ, মোজেক, দামী কাঠ, বাহারী কাচ, গ্রিল—এইসব দিয়ে শচীন লাটের বাড়ি। শহরের লোক কি যাকে তাকে লাট বলে, লাটের মেজাজ দেখেছে বলেই না শচীন মজুমদার লাট। মহুয়াবাগান এলেবেলে লোকের জায়গা নয় মশাই, এই শহরের জুয়েলদের পাড়া। 'জুয়েল মার্কেট'-ও বলতে পারেন। নতুন পাড়া, ভীষণ অ্যারিস্টোক্রাট। নতুন পাড়া বলে দেদার জমি পড়ে নেই, বেচাকেনা হয়ে গেছে। তবু বেশ ফাঁকা, কেননা সব জমিতেই বাড়ি হয়ে ওঠে নি, হচ্ছে, বারোমাসই কাজ চলে, ইঁট সুরকির স্তূপ যত্রতত্র। বছর কয়েক আগেও মহুয়াবাগান সেরেফ জঙ্গল ছিল। কিছু মহয়া গাছ ছাড়া যত ঝোপঝাড়, আগাছা। সেই জঙ্গল আজ শহরের এক প্রান্তে চাঁদের মতন উদয় হয়েছে। মাটিতে চাঁদের উদয়...ওই উপমাটা মহুয়াবাগানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া যায়। যত ডাক্তার, উকিল, ব্যবসাদার, রেলের রিটায়ার্ড অফিসার সব ওখানে গিয়ে জুটছে। তা জুটুক, তবু শচীন মজুম-দারের বাড়ি দেখলেই চেনা যাবে; বড় রাস্তায় ঢুকেই প্রথম বাঁ হাতি মোড়ে।

গাছপালা, বাগান, লোহার ফটক, কচি কলাপাতার রঙ ধরানো বাড়ি। ফটকের গায়ে শ্বেতপাথরে বাড়ির নাম লেখা—'সুধাস্মৃতি'। সুধা আমার মার নাম। মা মারা গেছে। শচীন মজুমদার স্ত্রীর স্মৃতি বাড়ির ফটকে ঝুলিয়ে প্রথমেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছে।

আমার বাবা শচীন মজুমদার এই শহরের ফেমাস লোক, শচীন লাট বললেও যেমন একডাকে চিনবে সেইরকম শচীন উকিল বললে চিনে ফেলবে। আমার বাবার পেশা ছিল ওকালতি। ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিশ করত। এখন আর বাইরে যায় না, ক্ষমতা নেই, বিছানায় শুয়ে বসে থাকে। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে যা কামিয়েছে তাতে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেও দিব্যি আরও পঁচিশটা বছর কেটে যাবে। লোকটার মাথার এমন গুণ যে এখনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরোনো মক্কেল বা জুনিআর উকিলদের পরামর্শ দেয়। তাতেও টাকা; টাকা, মান সম্মান, খাতির। মতি মার্চেণ্টের ছেলে ব্রিজলালকে খুনের মামলায় যেভাবে বাবা বাঁচিয়েছিল তা শুধু শচীন উকিলেরই সাধ্য। বাপ আমার ক্ষণজন্মা, মহাপুরুষ লোক, আমি, তার ছেলে কান্তি, বাবার মতনই ফেমাস। এই শহরের সবাই আমায় চেনে, বেশ ভাল করেই চেনে।

মিলি হঠাৎ গায়ে পা তুলে দিতেই কান্তির আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। কোথায় যেন কাক ডাকছে। কান্তি কান পেতে শুনল, হ্যাঁ—কাক। কাক ডাকছে। কাকের ডাক শুনে বেশ বোঝা যাচ্ছে, পশুপক্ষীর গলাতেও সকালের ঘুমের জড়তা থাকে। একটা কাক বার কয়েক ডাকার পর, বা হতে পারে, আরও দু-একটা কাক একইভাবে ডাকার পর কাকধ্বনি বাজতে লাগল বাইরে। তার মানে এখন ফরসা হয়ে গেছে, সকাল হয়ে এল।

কান্তি মিলির পা ঠেলে নামিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। হাই তুলল। তারপর জানলা খুলতে চলে গেল।

জানলা খুলতেই ভোরের বাতাস যেন এক দমকা ময়লা আলো এনে ফেলল ঘরে। না, বৃষ্টি নেই। ঠাণ্ডা, জলো বাতাস বইছে। আকাশ মেঘলা। পাতলা অন্ধকার ছেয়ে আছে। কাক ডাকছিল, কিছু পাখি-টাখিও জেগে উঠেছে।

কান্তি জানলার সামনে দাঁড়াতে পারল না। শীত শীত করছে। আলনার দিকে এসে হাতের সামনে মিলির একটা শাড়ি পেল, শাড়িটাই জড়িয়ে নিল গায়ে। দেরাজের মাথার ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে একটা ধরাল।

এত ভোরে কিছু করার নেই। কান্তির আরও খানিকটা ঘুমের দরকার ছিল। কে জানে কেন বেলা পর্যন্ত ঘুম হল না। মিলি কাল তাকে কম করে ওষুধ দিয়েছে কিনা বোঝা মুশকিল। দিতেও পারে। ইনজেকসান মিলিই দেয়, সে কমবেশী করে নেয়। মিলি যেভাবে মরার মতন ঘুমোচ্ছে তাতে মনে হয় ও নিজে বেশীই নিয়েছে।

কান্তি আবার বিছানায় গিয়ে বসল।

মিলি পাশ ফিরে পিঠ বেঁকিয়ে বাঁ পা কান্তির দিকে ছড়িয়ে দিব্যি

ঘুমোচ্ছে। কান্তি মিলির শোবার এবং ঘুমের ভঙ্গিটা দেখতে লাগল। বালিশের ওপর এক পাশের গাল চাপা আছে, মাথাটা নোয়ানো। গায়ে বিশেষ কাপড় নেই মিলির, বুকের তলায় জমে আছে পুঁটলির মতন। জামার বোতাম-টোতামও সব নেই, পুষ্ট স্তনের কিছুটা জমে থাকা ছায়ার মতন দেখা যাচ্ছিল, শোবার সময় জামার তলায় কিছু আর রাখে না মিলি। কোমর থেকে তার পেছন কাত হয়ে গড়িয়ে যাওয়া কলসির মতন দেখাচ্ছিল। পায়ের কাপড়, বাঁ পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে, খুব পরিষ্কার পা মিলির, লোমটোম যেন নেই, গোছ-টোছ ভারী।

কান্তি মিলির খোলা পায়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিল।

"মিলি?"

সাড়া নেই মিলির।

"এই মিলি?" পা নাড়াল কান্তি।

মিলি তখনও সাড়হীন। শুধু হাতটা নড়ল।

কান্তি মিলির মুখের দিকে ঝুঁকে খেলা কবার মতন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল আস্তে আস্তে, ধোঁয়াগুলো মিলিব বুকের কাছে জমতে লাগল যেন।

নাকে মুখে ধোঁয়া লাগায় মিলি বিরক্তির ভাব করল চোখে-মুখে।

কান্তি বলল, "সকাল হয়ে গেল। ওঠো।"

"হোক সকাল—" মিলি ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

"বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।"

মিলি আগের মতনই শুয়ে থাকল, তক্তাতের মধ্যে তার মুখ আর এখন খোলা নয়।

কান্তি মিলির চাপা, মোটা নাকের কাছে আবার আস্তে করে একটু ধোঁয়া ছড়ালো। নাক-মুখ কুঁচকে উঠল মিলির। "কী হচ্ছে?"

"ওঠো।"

"না, আমি এখন উঠব না।"

"আরে, ফরসা হয়ে সকাল হল...; উঠে পড়ো।"

"হোক সকাল। আমি ঘুমোবো।"

ফরসার ভাবটা ঘরের মধ্যে অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। গলিতে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। চড়ুইয়ের দল উড়তে শুরু করেছে, ডাক শোনা যাচ্ছিল। মিলির আজ ছুটি। ওঠবার কোনো তাড়া নেই।

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে নিবিয়ে দিল কান্তি, পায়ের আঙুলে তাত লাগল আগুনের। গলির মধ্যে নানকু ভারিঅলার মোটা গলা, প্রাতঃকালে জল তুলতে তুলতে রামসীতার গান গেয়ে নেয়।

মিলিকে যেন জাগাতে না পারলে কান্তির শান্তি হচ্ছিল না। পাশ ফিরে শোবার মতন করে বসল সে। বসে মিলির কোমরের তলায় হাত রাখল। খেলা

করার মতন করে ছোট ছোট চাপড় মারছিল পেছনে। "মাইরি, উঠে পড়।"

ছেলেমানুষের মতন পা ছুড়ল মিলি, হাত ঝাপটে মাথা নেড়ে না না করল, তারপর বাধ্য হয়েই তাকে চোখ খুলতে হল। কান্তি তার কোমরের ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েছে। থুতনির হাড় কোমরের খাঁজে লাগছিল।

মিলি বলল, "তোমার জন্যে ঘুমোতেও পারব না?"

"অনেক ঘুমিয়েছ। ওঠো।"

"কি করব উঠে?"

"চা ফা করো; খাই। আমি কখন থেকে জেগে বসে আছি।"

"কেন?"

"কি জানি, ঘুম ভেঙে গেল। তুমি কাল আমায় কম দিয়েছ।"

"বাজে কথা বলো না; তোমায় যা দেবার ঠিকই দিয়েছি।"

"তা হলে তুমি এতক্ষণ মড়ার মতন ঘুমোলে আর আমি কেন জেগে যাব?"

"তুমি কি আমার মতন! আমি পুরোনো। তাছাড়া সতেরো রকমের নেশা করো তুমি।"

কান্তি মিলির পেছনে আবার চাপড় মারল। "তুমি মাইরি কী কম নেশা কর?"

"বাজে কথা বলো না, তোমার সবরকম নেশা; তোমার গা চাটলে আমার নেশা ধরে যাবে।"

কান্তি হেসে ফেলল। "সকালবেলায় ভাহা মিথ্যে কথা বলো না।"

"কেন?"

"আমি তোমার নেশা নয়।"

মিলি চুপ করে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, "আমিও তোমার নেশা নয়।"

এবার কান্তি চুপ করে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন অনেক ফরসা। সকাল হয়ে গিয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকার দরুণ এই সকালের রঙ নেই, সাদাটে কাচের মতন নিরুজ্জ্বল। একেবারেই নিষ্প্রাণ। মিলির ঘরের কোনো কোনো জায়গায় এখনও হালকা অন্ধকার বসে আছে।

হাত বাড়িয়ে মিলি কান্তির মাথায় চুল ধরে টানল। "সরো, উঠি।"

কান্তি সরল না। বলল, "চুল টানো, বেশ আরাম লাগছে। কাল আমার ভাল ঘুম হয়নি।"

"যা হবার ঠিকই হয়েছে।"

কি মনে করে কান্তি বলল, "তোমার সঙ্গে শোয়া যায় না।"

একটু চুপ করে থেকে মিলি বলল, "তাই নাকি। কার সঙ্গে যায়? যেখানে যায় সেখানে গিয়ে শুয়ো।"

"তুমি বড় হাত-পা ছোঁড়ো। আমার গলায় এমন করে হাত রাখো আচমকা—"

"ও! হাত ঠেকে যায়—?" মিলি ঠাট্টা করে বলল, "বউয়ের হাত তো নয়।"

কান্তি মিলির হাত মাথার ওপর থেকে টেনে নিজের গলার কাছে রাখল। একটু সময় চুপচাপ; তারপর বলল, "কেউ আমার গলায় হাত দিলে মনে হয় আমার টুঁটি টিপে মারতে এসেছে। ঘুমের মধ্যে আরও ভয় করে।"

মিলি ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। শান্ত গলায় বলল, "এখন করছে না? গলার ওপর হাত নিয়ে রেখেছ?"

"না" কান্তি বলল, "এখন করছে না; এখন আমি জেগে আছি। বলে কেমন করে যেন হাসল, বলল, "আমি যতক্ষণ জেগে আছি ততক্ষণ কেউ আমার গলা টিপে ধরতে পারবে না। কিন্তু সব সময় তো আমি জেগে থাকি না। তখন?" কান্তি শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। মিলি আরও একটু শুয়ে থেকে উঠল। কাপড় গুছোতে গুছোতে বলল, "আজ আর রোদ উঠবে না।"

তিন

দুপুরবেলায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রী এসেছিল। বাড়িঅলার মিস্ত্রী নয়, কান্তি একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিল। ছেলেটা খুব চটপটে, চোখে-মুখে কথা বলে। বার কয়েক ওপর নীচ করল, চেয়ারের মাথায় ওপর দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিকের এ-তার সে-তার টানলো, কাটলো ছিঁড়লো, কালো ফিতে জড়ালো, তারপর টুক করে বাতি জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে তার কৃতিত্ব দেখিয়ে দিল। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, লাইন সব পচে গেছে দিদি, ওয়্যারিং পালটে ফেলুন, একদিন দপ্ করে সারা বাড়িতে আগুন লেগে যাবে।

টাকা নিয়ে ছেলেটা চলে গেল। চলে যাবাব সময় বলল, দরকার পড়লে আমায় খবর দেবেন, আমার নাম বিষ্টু, কাছেই কমলা ইলেকট্রিকস, সেখানেই থাকি।

ছেলেটা চলে যাবার পর মিলি ঘরের মাঝ মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া খেতে লাগল। ছোট পাখা, হুহু করে চলে, যত শব্দ হয়, তত বাতাস হয় না। পাখাটাকে কমানো বাড়ানোর উপায় নেই রেগুলেটার কোন যুগে নষ্ট হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। এই পাখাতেই মিলির চলে যায়।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস খেতে খেতে মিলির কেমন স্বস্তি লাগছিল। ঘরে যে জিনিসটা আছে সেটার প্রয়োজন সব সময় থাক না-থাক যদি সেটা অচল হয়ে থাকে, তবে বড় খারাপ লাগে। পাখাটার জন্যে মিলির সেই রকম যেন লাগছিল কাল থেকেই। এখন স্বস্তি লাগছে। কাল পাখার দরকার ছিল না। আজও নেই। সকাল থেকে বাদলা দিনের ভিজে নরম ভাব, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বাতাস রয়েছে; গুমোট নেই। সকাল থেকে রোদও ফোটে নি, বরং ইলশেগুঁড়ির মতন মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

পাখার তলায় দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড হাওয়া খেতে খেতে মিলি বড় আলস্য অনুভব করল। ছুটির দিন বলে সত্যিই কি ছুটি নাকি! সারা হপ্তার কত রকমের কাজ জমানো থাকে, তুলে রাখা সব কাজ নিয়ে বসতে হয় সকাল থেকেই। ছুটির দিনের বারো আনা এই করেই কেটে যায়।

মিলির এই ঘরবাড়ি আহামরি কিছু নয়, মাথা গুঁজে থাকা যায় এই যা। ভাড়াটাই যা কম। ঠিক এতোটা কমে হতো না, কিন্তু বাড়িঅলার নীচের তলার বোনকে সে এক সময় হাসপাতালে যথেষ্ট করেছিল। তার বোনের তখন যায় যায় অবস্থা। ইউটেরাসে ঘা। ভীষণ ভুগিয়েছে। হাসপাতালে বুড়ীকে অনেক দিন থাকতে হল। বুড়ীকে যত্নটত্ন দেখাশোনা মন দিয়েই করেছিল। তারই

প্রতিদান হিসেবে এই বাড়ি ভাড়া। মায় দু একটা আসবাবও। আরও একটু কারণ ছিল, গূঢ় কারণ; মিলি জেনে ফেলেছিল বাড়িঅলা আর তার বোন আসলে নিজেদের কেউ কিছু নয়, ওই বাড়িঅলাই এক সময় বুড়ীর ভাশুর ছিল। এখন সম্পর্কের দাদা হয়ে গেছে। এমন বাড়িতে মিলি যে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবে তাতে তার সন্দেহ ছিল না। পাড়াটাও পাঁচমিশেলী, ভদ্রজনের সংখ্যা বরং কম।

পাখাটা চলতে থাকল, মিলি এসে বিছানায় বসল। আলস্যে হাই উঠছে। কিন্তু এখন আর সে শোবে না, একেবারেই অবেলা হয়ে গেছে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সে বাস্তবিক জিরোবার সময় পায় নি। বৃষ্টি বাদলার দিন বলে আজ বেশী কাচাকুচি নিয়ে বসে নি, তবু আকাশ দেখে দু-পাঁচটা কেচেছে: শাড়ি জামা বালিশের ওআড়। বাথরুমের দিকের বারান্দায় এখনও তার শাড়ি ঝুলছে, পুরোপুরি শুকোয় নি, বৃষ্টি এলে ঘরে তুলে এনে এ-কোণ ও-কোণ বাঁধতে হবে। ঘরদোর পরিষ্কারও আজ নিজের হাতে করতে হয়েছে, ছুটির দিনে মিলিকে এ-কাজটাও করতে হয়, রোজকার ঠিকে ঝি দায়সারা ঝেঁটা বুলিয়ে কতটুকু আর পরিষ্কার করে। এখানে ধুলো, ওখানে ময়লা, কোথায় ইঁদুর ঢুকে আস্তানা গাড়ছে, বর্ষার দিনে পিঁপড়ে উঠছে গাদা গাদা—মিলিকে খুঁজে পেতে দেখতে হয়। পাশের ঘরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে না দেখলে ইঁদুরে আরশোলায় একাকার হয়ে থাকবে। এর ওপর কেরাসিনের স্টোভের পলতে কাটা, পরিষ্কার করা, তেল ভরা। রান্নাঘরেও নানা রকম খুঁটিনাটি কাজ।

মিলি আজ সবই করেছে। এমন কি বাথরুমের শ্যাওলা উঠিয়েছে অনেকটা, নালের ভাঙা ঝাঁঝরি দিয়ে আরশোলা উঠে আসে, ঝাঁঝরির মুখে ইঁটের টুকরো দিয়েছে সাজিয়ে, ফিনাইল ঢেলেছে। এতে করেও যে সে আরশোলার উৎপাত কমাতে পারবে তা নয়, ঠিকই আসবে ওরা। ওই একটু বেশী কম যদি হয়। আরশোলা মারা বিষ দিয়ে দেখেছে মিলি, সে আরও বিশ্রী। এত মরে যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝেঁটা হাতে মরা আরশোলা জড়ো করতে করতে তার ঘেন্না ধরে যায়।

আড়মোড়া ভেঙে মিলি বিছানার ওপর পা তুলে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন গা ভাঙল, জিরিয়ে নেবার জন্যে একটু বিছানায় গড়াল। আজ শেষ পর্যন্ত মাথাটা ঘষেই ফেলেছে মিলি। তার মাথায় অত চুল নেই মেঘের মতন যে বাদলার দিনে শুকোবে না।

ছাদের দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল মিলি। জানলা খোলা। মেঘলা বিকেলের আলো আসছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মিলি গলির নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সেই খেপা মুড়ি-বাদামঅলাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছেলেপিলে যোগাড় করছে, ইঁট ভাটির ভাঙা লরি যাচ্ছে গলি দিয়ে, একটা বউ চিৎকার করে ঝগড়া করে চলেছে, কার সঙ্গে কে জানে, ঠিকে ঝি-চাকরদের

গলা পাওয়া যাচ্ছিল, পাশের ফাঁকা জমিতে গোয়ালাদের দুধ দোওয়ার আয়োজনও বোঝা যাচ্ছে।

সকালে চালে-ডালে করেছিল মিলি, মানে খিচুড়ি। বুকের তলায় এখনও একটা ঢেঁকুর জমে আছে। নীচে থেকে পান আনিয়ে খেয়েছে। নীচের বুড়ী বেশ স্বাদ করে পান দিয়েছিল, জিবের সংগে স্বাদটা জড়িয়ে আছে তখন থেকেই। সেফটিপিন খুলে দাঁত খুঁটলো মিলি। তার একটা দাঁতে ক্ষয় ধরেছে, গর্ত হয়েছে মাড়ির পাশে, মাঝে মাঝে কনকন করে। তুলিয়ে ফেলতে হবে।

দাঁত তোলাবার কথায় মিলির মনে হল, সে কি বুড়ী হয়ে গেছে?

মনে মনেই যেন হাসল মিলি। কোন দুঃখে সে বুড়ী হতে যাবে। তার এখন ছাব্বিশ-টাব্বিশ বয়েস, দু-চার মাস কমও হতে পারে। বীণা বয়েসে তার চেয়েও ছোট হয়ে গায়ে গলায় চর্বি লাগিয়ে লাগিয়ে এমন কদাকার হয়ে গেছে যে, তাকে দেখলে আজকাল আর কেউ মেয়ে বলবে না। মিলির ধাত মোটেই ওরকম নয়, তার শরীরের গড়ন বরাবর আঁটসাঁট, যেখানে সেখানে থাবা থাবা হয়ে মাংস লাগে নি, মেদ জমে নি। হাসপাতালের ক'টা নার্স মিলির মতন ঝরঝরে? পদ্মজার চেহারা আরও ভাল। সে আরও তরতর করছে। তা হতেই পারে। জাতে মাদ্রাজী না কি যেন, ওদিকে কোথায় তাদের ঘরবাড়ি ছিল, আগের পুরুষে; গায়ের রঙ কালচে-খয়েরী, বেঁটে বেঁটে গড়ন, কিন্তু চোখ-মুখ গলা ঘাড় বেশ দেখতে। বয়েসে অবশ্য পদ্মজা মাত্র একুশ। মিলি তার চেয়েও বছর পাঁচেকের বড় হয়ে শরীরের বাঁধুনি টানটান রেখেছে। একদিন কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হাসপাতালের তরু কিংবা অরুণা হবে, 'মিলিদি তুমি এখনও কি করে সব রেখেছ?' জবাবে মিলি বলেছিল, 'হিসেব করে। মশারির চারদিকের খুঁট হিসেব করে যদি বাঁধিস, দেখবি সব ঠিক টানটান হয়ে আছে, একদিকে ঝুলছে, আর একদিকে চলছে—এমন কখনো হবে না। আমি হিসেবে চলি, তাই সব দিকে সমান টান।' ওরা হেসে মরে; বলল, 'আমরা বাবা একদিকটাই টেনে তুলতে পারি না, তো চারটে দিক। তোমার বাহাদুরি আছে।'

মিলির বাহাদুরি আছে বইকি। তার হিসেবটাই বাহাদুরি। হিসেবের বাইরে আরও একটা জিনিস রয়েছে। সেটা জন্মসূত্রে পাওয়া। মিলির এই যে শরীরের গড়ন-পেটন এ তার মার গর্ভে থেকে পাওয়া। তার মা ছিল মানভূম সিংভূমের মেয়ে, নীচু শ্রেণীর, আদিবাসী রক্তের মিশেল ছিল। মা ছিল অনাথা। মিশনারীরা মাকে 'আয় বাছা' করে নিয়ে গিয়ে তাদের অনাথালয়ে মানুষ করেছিল। সেখানেই মার শিক্ষাদীক্ষা। লিলিমণি নাম হয়েছিল মার, ধর্মে হয়েছিল খেস্টান। যুদ্ধের সময় তখন নাকি ও পাশে গণ্ডায় গণ্ডায় ছাউনি পড়েছে ঝোপে জঙ্গলে, মিলিটারীতে ভরা। কোথায় কোন ছোট হাসপাতাল ছিল ছাউনির, লিলিমণিদের সেখানে পাঠানো হত ঝি আয়ার কাজ করতে। দু' পাঁচজন সিস্টার-দিদির সঙ্গে লিলিমণিরা কাজ করত, আবার ফিরে আসত নিজেদের অনাথালয়ে। মিলিটারীর লোকগুলো ছিল হাড় হারামজাদা; মেয়ে-

ছেলের গন্ধ পেলে বনবাদাড়, বয়স, ডোম বাউরি, কালো খয়েরী কিছুই মানত না। হামেশাই আলপাকার শাড়ি পরা, চুলে রুপোলী ফিতে বাঁধা কুচকুচে কালো রঙের মেয়েগুলো আসত যেত, ডগমগে হয়ে থাকত। লিলিমণিদের নিয়েও টানাটানি, খামচাখামচি চলত। সহ্য করতে করতে আর যখন পারল না মা তখন একদিন পালিয়ে গেল। কৃষ্ণপদ মণ্ডল বলে একটা লোকের সংগে মার চেনাশোনা ছিল। তার কাছে গিয়ে মা আছড়ে পড়ল। কৃষ্ণপদর ছিল হাত পাঁউরুটি আর নোনতা বিস্কুটের ব্যবসা। কৃষ্ণপদর সঙ্গে বিয়ে হল মার দাশনগরের গির্জেয় গিয়ে। কৃষ্ণপদ আর লিলিমণি সংসার পাতল, পাঁউরুটি-বিস্কুটের ব্যবসা ভালই চলতে লাগল। দুজনেই সমান খাটিয়ে। মিলি জন্মানোর আগেই কৃষ্ণপদ মরে গেল, ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে। বিয়ের আগে পর্যন্ত মা ছিল একা, এখন আট মাসের মিলিকে পেটে নিযে একেবারে জলে পড়ল। আবার সেই অনাথ। পাঁউরুটি বিস্কুটের ব্যবসা চালাবার ক্ষমতা মার ছিল না, পেটে বাচ্চা, বয়েস মাত্র কুড়ি। কৃষ্ণপদর এক দিদি থাকত বাঁকুড়ায়, নয়নতারা, সে এসে ব্যবসা বেচে দিযে লিলিমণিকে নিয়ে চলে গেল বাঁকুড়ায়।

মিলি যখন জন্মেছে তার মার বয়েস ছিল কুড়ি। মা বেঁচে থাকলে আজ মার বয়েস হত ছেচল্লিশের কাছাকাছি। মা মারা গিয়ে ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকার বড় ধকল। মাকে কত ধকলই সইতে হয়েছে। তারাপিসি বলত, কুকুর যদি মাদি হয় আর পুকুরের জল যদি ভরা থাকে কোনো শালার সাধ্যি নেই তাকে আড়াল রাখবে। তোর মা ছিল জোয়ান মাদি, আমার বাড়ির উঠোনে খেয়োখেয়ি করত হারামজাদা কুকুরগুলো।

তারাপিসির বর ছিল না, দেওর ভাশুর ছেলেপুলে কিছু ছিল না। বাঁকুড়া বাজারের দিকে একতলা ভাঙাচোরা বাড়ি ছিল একটা, সেখানে থাকত, লোকের বাড়ি বাড়ি বাচ্চা বিইযে বেড়াত, হাসপাতাল আর বাজারের ডাক্তারদের সঙ্গে ভাবসাব ছিল। তারাপিসি ছিল অদ্ভুত মানুষ, মুখে কোনো কথাই আটকাত না, শালাটালা তো মিলিকেও বলত, ঘটি করে দেশী মদ খেত, ফোলা ফোলা মুখ, লাল লাল চোখ করে নেশার ঘোরে যেন মজা করেই খেস্টান ভজনা গাইত। তারাপিসিই মিলিকে মানুষ করেছে।

মিলি যখন স্কুলে পড়ছে, স্কুলের উঁচু ক্লাসে, বয়েস বোধ হয় চোদ্দ-পনেরো হবে, তখন মা এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড করল। একটা টনটনে ছোঁড়া, বাঁকুড়া-বর্ধমান বাস চালাতো, তার সংগেই পালিয়ে গেল। মার বয়েস তখন পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ, ছোঁড়া মার চেয়ে দু-তিন বছরের ছোটই হবে, কিন্তু মাকে সে মজিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারাপিসি বলল, যাক, একটা জায়গায় থিতিয়ে বসুক শালী।

মিলিকে আর স্কুল শেষ করতে দেয় নি তারাপিসি, ডাক্তারটাক্তারদের ধরে নার্সিং শিখতে পাঠিয়ে দিল। আদ্রায় গিয়ে উঠেছিল মা, সেখানেই টাইফয়েড হয়ে মারা যায়। চিঠি এসেছিল পিসির কাছে।

মিলি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠার পর তারাপিসি মারা গেল। ঘটি ঘটি

মদ খেয়ে, তার সঙ্গে আফিংয়ের নেশা করে শরীরের কিছু রাখে নি, একদিন মাথায় চোট খেল, পড়ল, তারপর দেখতে দেখতে মরে গেল। এইভাবেই যেন যাওয়া উচিত ছিল তারাপিসির।

ধর্ম-অধর্ম কোনো কিছুই মানত না পিসি। কস্মিনকালেও গির্জেয় যেত না, খেস্টানদের কীর্তনের আসরে বসত না, হিন্দুদের বেলপাতা হাতে দিলেও ছুঁতো না। নেশা করত, কড়া তামাক পাতার বিড়ি টানত হুস হুস করে। দাইগিরিতে পিসির খুব নামডাক ছিল, নিজের কাজে ষোলো আনা যত্ন ও সেবা ছিল। ওখানে ফাঁকি ছিল না পিসির, একটা বাচ্চা বিইয়ে এলে নিজের গরজেই দিনের পর দিন গিয়ে দেখাশোনা করে আসত।

মার সম্পর্কে মিলির না আছে রাগ, না অভিমান। মা যখন চলে যায়, তখন খানিকটা অভিমান হয়েছিল, বয়সটাও যে কম ছিল তখন। পরে আর কিছু হয় নি। তাদের সমাজে এ-ভাবে বিয়ে থা হয়, এক স্বামী মারা যাবার পর অন্য পুরুষকে বিয়ে করা গর্হিত নয়। বাচ্চাকাচ্চা নিয়েও কত মেয়ে বিয়ে করে আবার লিলিমণি দোষের কিছু করে নি। তবে অতটা বয়সে নিজের চেয়ে ছোট একটা ছোঁড়াকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা ভাল হয় নি। মিলির জন্যেই বোধ হয় মা সামনাসামনি কিছু করতে পারে নি। তারাপিসির ভয়েও হতে পারে।

মার কথা মনে পড়লে মিলি যাকে দেখে তার গায়ের রঙ খয়েরী কালো, চোখ-মুখ চাপা, খাটো, বড় বড় চোখ, মোটাসোটা ভুরু, পুরু নাক, চ্যাপ্টা ঠোঁট। দেখতে নিশ্চয় পরীর জাত ছিল না, কিন্তু পেটা শক্ত সমর্থ চেহারা ছিল, গড়ন ছিল আঁটোসাঁটো, ডাগর চোখে আর টেপা নাকে এমন কোনো রক্তের মিশেল ছিল যে মা পুরুষমানুষদের বড়ই জ্বালাত। স্বাস্থ্য মার ছিল, গতর খাটাতে আলস্য ছিল না। গতর না খাটালে অনাথালয়ে ডাল-ভাত ঝিঙের তরকারি জুটত না। শরীরকে যতটা তাজা রাখা যায়, তার চেয়ে কম ছিল না মার। মেটে রঙের এক মাথা চুল নিয়ে মিলের শাড়ি পরে মা যখন পিসির বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত, পথ চলতি মানুষ তখন এমন করে তাকাত যেন পুকুর থেকে পেছল গায়ের মস্ত একটা কাতলা মাছ উঠেছে, কার সাধ্য সেদিক থেকে চোখ ফেরায়। তা বলে লিলিমণির ঘর বিছানা বারো পুরুষের শোয়াবসার জায়গা ছিল না। তারাপিসির বাড়িতে যে রয়েছে তার ঘরে এসে শোবে এমন পুরুষ মানুষ বাঁকুড়া শহরে থাকার কথাও নয়। তবে, আড়ালে কত রকম ডাকাডুকো ইশারা, বাঁশি মারা চলত। বাড়িতে যারা ঢুকত তারা পিসির ইয়ার বন্ধু। পিসির সঙ্গে মদ খেতে আসত, দিশী মদ। আরো নানান বয়সের মানুষ ছিল, ছোঁড়া গোছেরও থাকত। নেশার সময় মার সঙ্গে মশকরা হত, কখনো কখনো সেই সুযোগে যে দু-একজন মার কাপড়-চোপড় ধরে না টেনেছে, বা রান্নাঘরে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমুটুমু না খেয়েছে, তাও নয়। খেস্টান ডাঙ্গার অনেকেই তারাপিসিকে ভজিয়ে মার সঙ্গে মাখামাখি করতে চেয়েছিল, তারা কেউ কেউ বিয়ে করতেও রাজী ছিল। আর হিন্দুগুলো ইঁদুরের মতন গর্ত দিয়ে তারা-

পিসির বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছে।

চব্বিশ ঘণ্টা কোনো মানুষকে চোখেচোখে রাখা যায় না। লিলিমণি তার ননদ আর মেয়ের আড়ালে কী করত মিলিরা জানে না। না জেনেও মিলি বলতে পারে, তার মা একমেটে মেয়েছেলে ছিল না। ভেতরে ভেতরে মার ছটফটানি ছিল। সেই অনাথ বয়েস থেকে চিরটাকাল ঘা খেয়েছে, নিজের মরজি মতন লচতে পারে নি, তার মুখের সামনে কেউ ঘোড়া জুতে দিয়েছে আর মা পেছনের গাড়ির মতন ঘড়ঘড় করে চলেছে। তার তাহলে নিজের বলে কি থাকল? নিজের মর্জিতে যা করেছিল—সেটা হল পালিয়ে এসে কেষ্টপদ মণ্ডলের পায়ে ঝাপিয়ে পড়া। বিয়ে করা। মিলি গল্প শুনে শুনে এটা বেশ বুঝেছিল, কেষ্টপদ মার ভালবাসার মানুষ ছিল। মা যখন অনাথালয়ে তখন কেষ্টপদ ওদিক পানেই ঘোরাফেরা করত, আবদুল্লার রুটি কারখানায় চাকরি করত, মাঝে মাঝে এসে গির্জের বাগানে মাটি কুপিয়ে যেত, বাগানে কাজ করে দিত। কেষ্টপদ বেঁচে থাকলে মার জীবন একরকম হত হয়ত, মারা গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেল। অমন ভরা শরীরের তলায় মস্ত একটা বালির চরা খাঁখাঁ করবে দিনে দুপুরে রাতে, আর মাসের পর মাস তাত খেয়ে যাবে তা বোধ হয় হয় না। লিলিমণির তো জাত জন্ম নেই, মা-বাপ নেই, স্বামী নেই, থাকার মধ্যে একটা মেয়ে, যে-মেয়ে আবার তার পিসির আঁচলে বাঁধা হয়ে গেছে। মার শরীরের মধ্যে কাতরানি ছিল, মনে কিছু সুখ তৃপ্তির আশা ছিল। শেষ পর্যন্ত মা পালাল।

তবে, মিলি একটা জিনিস দেখেছে। লিলিমণি কোনোদিন নিজেকে নিশ্চিন্ত অনুভব করেনি। ভরসাও যেন করত না। ভেসে থাকার মতন থাকত, মাঝে মাঝে কোথায় যে ডুবে যেত বোঝা যেত না, ধরা যেত না। তখন মাকে বড় দুঃখী, দীন, দূরের মানুষ দেখাত। মনে হত, জগৎ সংসারের সমস্ত দুঃখ এসে মার ভোগব চোখ ছেয়ে ফেলেছে।

দরজায় নাড়া পড়তেই মিলি মার দুঃখ ভুলে দরজার দিকে তাকাল।

"কে?"

"আমি কালীপদ।"

মিলির কেমন হাসি পেল। উঠে বসতে বসতে জানলার দিকে তাকাল একবার, জানলার ফাঁক দিয়ে একটা শালিখ উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেল, ডানায় সাদা ছোপ ধরা।

দরজা খুলে দিল মিলি।

কালীপদ ভেতরে ঢুকল। এক হাতে ছাতি, অন্য হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ, চিট ময়লা। এখানকার ব্রজসুন্দর মেডিকেল স্টোর্সের কম্পাউণ্ডার। বছর চল্লিশ বয়েস। শেয়াল শেয়াল দেখতে, রঙটি কালো।

মিলি হেসে বলল, "ভাবছিলাম কেষ্টপদর কথা, এল কালীপদ।"

অবাক হয়ে কালীপদ বলল, "কেষ্টপদ কে?"

মিলি কি ভেবে বলল, "মণ্ডল ফার্মেসীর লোক।"

কালীপদ যেন এক নিমেষে খাতার পাতা উলটে মনে মনে হিসেব করে নিল। বলল, "এখানে মণ্ডল ফার্মেসী আবার কোন দোকান? ঝালদার এক বিপিন মণ্ডল এসে দোকান দিয়েছে, সে তো ওষুধের দোকান নয়।"

মিলি রঙ্গ করে বলল, "এখানেই সব ওষুধের দোকান থাকতে হবে তার কি মানে আছে? অন্য জায়গা থেকে এসেছিল।"

কালীপদ সন্দেহ করল, মিলিকে নজর করে দেখতে দেখতে বলল, "এই শ্যের দোষ করলুম কি!"

"না, আমি ব্রজসুন্দরকে আর কিছু দেব না।"

"কেন?"

"আপনারা বড় ঠকান।"

কালীপদ ছাতাটা এক কোণে রেখে এমন করে হাসল যেন ময়রা রসের পাক দেখছে। বলল, "আমি ঠকাবার কে দিদিমণি, আমার দোকান না আমার পুঁজি, মাস গেলে একশো সোয়াশো টাকা মাইনে পাই। আমি ঠকাই না; ঠকায় মালিক। মালিককে বলব।"

মিলি ঠোঁট কেটে হাসল। "মালিককে পাঠিয়ে দেবেন, তার সঙ্গেই কথা হবে।"

কালীপদ এবারে একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, "কিসে ঠকাচ্ছি বলুন। আজকাল বাজার বড় খারাপ। চার-ছ পয়সা কম বেশীতেই খদ্দের পালায়। আমরা তো পাল ফার্মেসী নয়, ঠাণ্ডা মেশিন রেখে টিউবলাইটের চকমা মেরে দোকান করি নি। ওদের এলাহি কাণ্ড। আমাদের গরীব দোকান, দিদি; খদ্দেরও গরীব।"

মিলি ব্রজসুন্দর মেডিকেল স্টোর্স ভাল করেই চেনে। নিজে কোনোদিন দোকান মাড়ায় নি, ব্রজসুন্দরের মালিকও কখনো মিলির কাছে আসে নি। কালীপদই মাঝখানের লোক; তার হাত দিয়েই কাজ কারবার। মিলি বিশ্বাসই করে না কালীপদ একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

চালাকি করে মিলি বলল, "আচ্ছা দেখি, অন্য জায়গায় খোঁজ করে দেখি।"

কালীপদ আরও চালাক। বলল, "পয়সাটাই বড় করে দেখবেন না দিদি, বিপদ আপদও তো আছে। আমরা পুরোনো লোক, আপনার ক্ষতি চাইব না। নতুন লোক কখন কি করে বসবে, ঘাড়ে কোপ পড়বে আপনার। সেই মিত্তির দিদিমণির অবস্থা হবে।"

আর কথা বাড়াল না মিলি। বলল, "দর কিছু বাড়াতে হবে। আজকাল যেভাবে জিনিস বের করে আনতে হয়, বিপদ সব সময়েই।"

কালীপদ কয়েক পলক মিলিকে দেখল, তারপর বলল, "এবারটা যাক্। মালিককে বলি।"

মিলি পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এল খানিকটা পরে। হাতে কটা ইনজেকসান, ট্যাবলেট, গ্লুকোজের বড় বড় অ্যাম্পুল, মায় দু-একটা দামী

খাবার ওষুধ।

কালীপদ তার হাতের থলিতে ওষুধগুলো রাখল। রেখে গামছা মতন কি একটা চাপা দিল।

মিলি বলল, "ছেঁড়াফাটা ময়লা নোট দেবেন না।"

জামার ভেতর পকেট থেকে খামের মধ্যে রাখা টাকা বার করল কালীপদ। পঞ্চাশটা টাকা দিল। বলল, "দু-চার টাকা বেশী দেওয়া থাকল, পরে হিসেব করে দেখব ভাল করে।"

মিলি বলল, "বেশী দেবার হাত আপনাদের! কী ঠকান ঠকাচ্ছেন।"

"না দিদি, ও কথা বলবেন না। আমরা নায্য দাম দিয়েছি। দোকানে এই জিনিস আরও বড়জোর দু-চার আনা বাড়িয়ে বেচতে হবে, নয়ত খদ্দের নেবে না। পাশের দোকানে ছুটবে। যা বাজার আজকাল, পুঁটি মাছের দর করে ব্যবসা চালাতে হয়।"

মিলি হাসল। জোরে নয়, বাঁকা করে।

কালীপদ ছাতা তুলে নিয়ে বলল, "আজ তাহলে আসি।...ইয়ে, মাঝে একবার আসব নাকি? ধরুন বুধবার নাগাদ?"

"না না, মাঝে আর আসতে হবে না। এখন যে জায়গায় আছি সেখানে অত হয় না। পরে আসবেন।"

কালীপদ শুভার্থীর মতন বলল, "রয়ে সয়ে থাকাই ভাল।"

দরজা খুলে চলে যেতে গিয়ে কালীপদ হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "দু-চারটে মরফিন কি আসছে বারে পাব?"

মিলি কালীপদর সরু ঘাড় লক্ষ করতে করতে বলল, "আপনাদের লাইসেন্স আছে মরফিন বেচার?"

"লাইসেন্স রেখে কি হবে! আমরা বিনি লাইসেন্সেই বেচি।"

"বেচে যাচ্ছেন যান, যখন ধরা পড়বেন; তখন জেল হাজত..."

হেঁচকি তোলার মতন করে হাসল কালীপদ। "কে কাকে জেলে ধরে! আইন হল পয়সার। পয়সা ফেললে আইন আমার। কী আমার সত্যযুগে আছেন, দিদি...!"

কালীপদ যেন সব কিছু তুচ্ছ করে দিয়ে হাসি মুখেই ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।

মিলি হঠাৎ বলল, "বর্ধমানে আপনার সেই ভায়রার চিঠি পেলেন?"

"পাই নি। পাব। সে আবার প্রায়সময় কালনায় গিয়ে থাকে। তা বর্ধমানে ঘর-বাড়ি দেখে আপনার কি হবে দিদি?"

ঠাট্টা করে মিলি বলল, "কেন, কিনতে পারি না!"

কালীপদ চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ করে দিল মিলি; ছিটকিনি তুলে দিল। তার হাতের মুঠোয় টাকা। বিকেল দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এসেছে। মেঘলার বিকেল আর কতক্ষণ

থাকে। একটু পরেই একেবারে ঝাপসা হয়ে যাবে। মাথার ওপর পাখাটা বন বন করে চলছে। মিলির এবার অস্বস্তিই হচ্ছিল। ভিজে বাতাসের মধ্যে এই হাওয়া আর ভাল লাগছিল না। পাখা বন্ধ করে দিল।

কাপড়গুলো তুলতে হবে, চা বসাতে হবে, শরীর আইঢাই করছে। মিলি হাতের টাকাগুলো নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। বাক্স সুটকেশ বিছানার তলায় বা দেরাজে সে টাকা রাখে না। রাখার বিপদ রয়েছে। চোর-ছ্যাঁচড় বাদ দাও, তারা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে কান্তি, ঘরের শত্রু বিভীষণ। টাকা-পয়সার ব্যাপারে মিলি কান্তিকে বিশ্বাস করে না। কান্তি দেরাজের ড্রয়ার থেকে, মিলির ব্যাগ থেকে, বিছানার তোশকের তলা থেকে অনেক বারই টাকা নিয়েছে। জিজ্ঞেস করলে সরাসরি স্বীকারও করে নেয়।

পাশের ঘরে মিলির গোপন জায়গা আছে, সেখানে অনেক সময় ওষুধ রাখে, টাকাও রাখে। সাধারণ একটা বড় কৌটো টঙে তোলা থাকে, মনে হবে রান্নার ডাল-মশলা বা এই ধরনের কিছু আছে। আর রাখে এমন জায়গায় যেখানে চোর-ছ্যাঁচড় বা কান্তির হাতে পড়বে না কোনোদিনই।

টাকা রেখে শোবার ঘরে ফিরে এসে মিলি দেখল, জানলার ওপাশে ইলশে-গুঁড়ি ঝরছে। মেঘলা যেন আচমকা কালো হয়ে আসছে আবার।

কাপড় তুলতে ছুটলো মিলি।

কাপড় তুলে এনে ঘরে ফেলল, বিছানার ওপর; বৃষ্টি নেমে গিয়েছে ঝির-ঝির করে। বড়ই আনচান করছিল শরীরটা। মিলি একটা সিগারেট ধরিয়ে চা করতে গেল।

চার

ত্রিদিবদের গ্যারাজের অফিস ঘরে কান্তি আরাম করে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল। ছোটখাটো অফিস ঘর, আসবার বলতে টেবিল, গোটা দুই-তিন চেয়ার, সেকেলে আর্মচেয়ার একটা, আর লোহার আলমারি। বেঁটে মতন ভারী সিন্দুকও রয়েছে একপাশে। দেওয়ালে দুটো ক্যালেন্ডার আর ত্রিদিবের বাবার ছবি। টেবিলের ওপর কোকাকোলার একটা খালি বোতল আর কাচের গ্লাস পড়ে ছিল।

আর্মচেয়ারে শুয়ে পা ছড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে কান্তি ছোট জানলার ওপারে ডালিমগাছটা দেখছিল। সন্ধ্যে হয়ে এল। কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

ত্রিদিব ঘরে ঢুকে বলল, "এই, একটু দেখ তো!"

কান্তি মাথা না ঘুরিয়েই বলল, "কি দেখব?"

"দিনেশ রায়দের জিপটা গড়বড় করছে।"

"রেখে দিয়ে যেতে বল; কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ধ্যাত শালা, রায় পার্টি কি ওতে ভোলে?"

"তবে তুই অন্যভাবে ভোলাগে যা!"

ত্রিদিব বেশ বিচলিত বোধ করছিল। দিনেশ রায় হালের লিডার লোক, এবারে এ তল্লাটে তারই দাঁড়াবার কথা চলছে, অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়েছে, মাঝে মাঝে তারা এসে ত্রিদিবের কাছ থেকে খরচা নিয়ে যায়। এ-রকম একটা লোককে মুখের ওপর 'গ্যারাজ বন্ধ, গাড়ি রেখে যান' বলে তাড়ানো মুশকিল। কারখানায় এখন শ্রীপতি নেই, ধর্মদাস নেই, থাকার মধ্যে বিলাস ছিল। হাতটাত ধুয়ে জামা পালটে বিলাসও চলে যাচ্ছিল, ত্রিদিব তাকেই ধরে দিল। তা বিলাস হল ঠুকঠাকের মিস্ত্রী, ধরা করার কাজ করতে পারে, তার দ্বারা কাজের কাজ হয় না। বিলাস পারে নি। দিনেশ রায়ের জিপগাড়িতে কার্বুরেটারের গণ্ডগোল হয়েছে, তেল আসছে বেশী, গাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কান্তি একপার্ট, পাকা ঘাঘু মিস্ত্রীদেরও চমকে দেয় কখনো কখনো। শ্রীপতির মতন লোকও কান্তিকে খাতির করে। তেমন তেমন ঘটলে কান্তিকে এসে ধরে, বলে 'কান্তি-বাবু, দেখেন তো একটিবার, গাড়িটা কায়দায় আসছে নাই।' কান্তি বলে, 'চলো দেখি।'

ত্রিদিব দেখল, কান্তি যেমন কে তেমন, বরং চোখ বুজে সিগারেট টানছে, তার বিন্দুমাত্র গরজ নেই দিনেশ রায়ের জিপের কি হলো না হলোয়। ত্রিদিব বলল, "এই, এই শালা—!

কান্তি বলল, "কী?"

"জিপের মধ্যে দিনেশ নিজে রয়েছে, তার সঙ্গে দু-তিনটে চেলা। গোপালও আছে।"

"তাতে শালা আমার ইয়ে হবে।"

"তোর আবার কি হবে! তোর যা হবার হয়ে গেছে। আমার যে শালা পাইপ ঢুকে যাবে।" বলে ত্রিদিব হাতের মুঠো দিয়ে পাইপের পরিধি দেখাল।

কান্তি বলল, "ঢুকুক।"

ত্রিদিব কান্তির গায়ের ওপর প্রায় যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, বলল, "যাঃ মাইরি, অমন করিস না। তুই বন্ধু লোক, ব্যবসা করে খাই, দিনেশ খচড়ার সঙ্গে খটাখটি করলে গ্যারেজ তুলে দিতে হবে। ও শালা কী মাল জানিস না?"

কান্তি ত্রিদিবের মুখের দিকে সরাসরি তাকাল। বলল, "সব মালকেই জানি। তুমি মাল, তোমার দিনেশ মাল, সব মালবাবুদের চিনি। ঝঞ্ঝাট করো না, কেটে পড়ো।" বলে কান্তি ত্রিদিবকে সরিয়ে দেবার জন্যে ঠেলা দিল।

ত্রিদিব সরল না। বলল, "তুই শালা যখনই মাল খেয়ে থাকিস, তখনই বড় অ্যারোগাণ্ট।"

"আমি এখন নেশায় নেই।"

"মাতালরা কোনোদিন নেশায় থাকে না। নে ওঠ।"

"নেভার।"

"কান্তি, তুই আমার বিপদটা বুঝতে পারছিস না।"

"আমি কেন বুঝব, আমি লিডার? লিডাররা মানুষের আপদ-বিপদ বোঝে, দুঃখ বোঝে। দিনেশকে বোঝা গে যা, সে লিডার। কারখানা ছুটি হয়ে যাবার পর যে কাজ হয় না, কাউকে দিয়ে কাজ করানো যায় না—এটা সে জানে না? ওই বাগোত বরফ-কারখানার কি যেন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট না?"

ত্রিদিব দেখল তর্ক করা বৃথা। তর্কে কান্তিকে বশ করা যায় না। হঠাৎ খুব আদুরে গলায় বলল, "ঠিক আছে। তুই কাজটা করে দে, ছোট কাজ বাবা. বেশী ঝামেলা করতে হবে না, আমি তোকে মাল খাওয়াব।"

খুবই আশ্চর্য, টোপটা লাগল না। কান্তি মাথা নাড়ল। "আমি শালা তোমার ঘুষ নেব না।"

"ঘুষ! তুই আমার কাছে টাকা নিস না?"

"সেটা বন্ধুত্ব। তোর পাছায় লাথি মেরে আমি বিশ-পঁচিশ টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে পারি। তুই মরে গেলে হাউমাউ করে কাঁদতে পারি। তা বলে শালা ঘুষ...উঁ, ঘু—ষ" বলে মুখ ছুঁচলো করে কান্তি মজার এক শব্দ করল।

ত্রিদিব হতাশ হয়ে বলল, "শালা, মালখোর।"

কান্তি নিস্পৃহ ভাবে হাসছিল।

ততক্ষণে দিনেশ রায়ের এক সাকরেদ অফিস ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে। ঢুকেই দেখল কান্তি পা ছড়িয়ে একপাশে বসে আছে। কান্তিকে

দেখেই ছোকরা যেন একটু চেপে গেল। এক পলক কান্তিকে দেখে নিয়ে ত্রিদিবের দিকে তাকাল। মেজাজের গলায় বলল, "কী হল ভাদুড়িদা, কোন হাতুড়েকে লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলেন, ওর দ্বারা হবে না। যা সব জুটিয়ে রেখেছেন..."

ত্রিদিব খুব অস্বস্তির সঙ্গে ছোকরার দিকে তাকাল, তারপর কান্তির দিকে। ছোকরার নামটা ঠিক জানে না ত্রিদিব, ব্যোমকেশ কিংবা পুলকেশ হবে। ত্রিদিব বেশ খাতির করে বলল, "বড় মিস্ত্রী চলে গেছে ভাই, আর মিনিট পনেরো বিশ আগে এলে শ্রীপতিকে পাওয়া যেত।"

ব্যোমকেশ বা পুলকেশ বলল, "আপনার বড় মিস্ত্রীর টাইম নিয়ে গাড়ি খারাপ হয় না দাদা।" কথার স্বরে ব্যঙ্গ, এক ছলক হাসি। "তা একবার বাইরে চলুন। বৃষ্টিতে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে ঘরের মধ্যে রয়েছেন। এভাবে ব্যবসা চলবে?"

ত্রিদিব ফরসা নয়, তবু অপমানে তার চোখ-মুখ খানিকটা লালচে হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে ত্রিদিব বলল, "না ভাবছিলাম কিছু যদি করা যায়।"

"কী করবেন?"

কী করবে ত্রিদিব জানে না। কান্তির দিকে চোরা চোখে তাকাল একবার। কান্তি চুপচাপ লাটের মতন শুয়ে আছে। শালা, খচ্চর, হারামজাদা।

ছোকরা বলল, "যা করার করুন। দিনেশদা টকে যাচ্ছে। আজ সাড়ে ছ'টায় আমাদের এক জায়গায় যাবার কথা, জরুরী, পৌনে ছয় বেজে গেছে। ছ'সাত মাইল যেতে হবে।...আসুন, দিনেশদা ডাকছে—।"

"যাই।"

ছোকরা চলে গেল। ত্রিদিব রাগে ক্ষোভে হাত পা ছুঁড়ে কান্তিকে যেন মেরেই বসবে এমন ভাব করে বলল, "দেখলি শালা, নিজের চোখে তো দেখলি, ওই শুয়ারের বাচ্চা সেদিনকার লাপটা কী রোয়াব নিয়ে গেল। আমি তোর এত হাতে-পায়ে ধরলুম..."

কান্তি অক্লেশে বলল, "আমি এখন মাল খেয়ে আছি, আমার হাত পা ঠিক নেই. মেকানিক্যাল কাজ সূক্ষ্ম কাজ রে শালা, মাল খেয়ে হয় না।"

ত্রিদিব অশ্লীল একটা গালাগাল দিল কান্তিকে।

কান্তি হাসতে হাসতে বলল, "আমি যেতে পারি; তবে এর পর দিনেশের গাড়ি লাইফে আর চলবে না। কার্বুরেটার না পালটানো পর্যন্ত নয়। নয়ত অ্যায়সা করে দিয়ে আসব যে ফায়ার লেগে যাবে।"

"থাক্।...আমার কারবার গেল।...যাই দিনেশবাবুর ইয়েতে তেলফেল দিয়ে দেখি।"

ত্রিদিব চলে যাবার পর কি মনে করে কান্তি উঠে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কী হয় দেখবার কৌতূহলেই বোধ হয়। অফিস ঘরের এক পাল্লার দরজা আস্তে করে খুলে কান্তি মুখ বাড়াল। শেডের বাইরে দিনেশের জিপ, করোগেটেড

টিনের ফটক খোলা, ছোট নিমগাছের তলায় দিনেশের দুই চেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্যারাজের একটা বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। জিপের মুখটা বাতির দিকে। মিহি বৃষ্টি পড়ছে, শব্দ নেই, চোখেও দেখা যায় না। ত্রিদিব গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল আপ্রাণ।

অল্প সময় কান্তি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর পা পা করে এগিয়ে শেডের একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দিনেশ গাড়ির মধ্যে বসে, ভেতরে গোপাল। বিলাস হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনেশ বলল, "সব বুঝলাম; কিন্তু আমার কী হবে?" দিনেশের গলার স্বর রুক্ষ, ঝাঁঝালো। ত্রিদিবকে যেন ধমকাচ্ছে।

ত্রিদিব বলল, "পুরো খুলেখালে না দেখলে হবে না, রায়দা। কার্বুরেটারের কাজে সময় লাগে। ঠেকা দিয়ে ছেড়ে দিলে রাস্তায় আবার আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন। কাল কারখানা খুললেই করিয়ে দেব।"

"কাল কি হবে তা জেনে আমার লাভ নেই। আজ কি করা যাবে? সাড়ে ছ'টায় আমায় ঘুষড়িতে পৌঁছতেই হবে, লোকজন অপেক্ষা করছে। আপনাদের যত হ্যারাসিং কারবার, একটা টিনের চালা রেখে বসে আছেন, আর লোকের পকেট কাটছেন। ইউজলেস এইসব গ্যারেজ রাখার দরকারটা কি?"

নিমগাছার তলা থেকে এক সাকরেদ বলল, "দিনেশদা, গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ি নিয়ে নিলেই তো হয়।"

ত্রিদিব খুব বিনয় করে দিনেশকে বলল, "আমি দরোয়ানকে একটা গাড়ি ডাকতে পাঠিয়ে দি, কাছেই কর্মকার গাড়ি রাখে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে যাবে।"

দিনেশ বিরক্ত ভাবে বলল, "যা হয় করুন, তাড়াতাড়ি। আপনার মতন অঢেল সময় আমার হাতে নেই।"

ত্রিদিব গ্যারাজের দরোয়ানকে ডেকে কর্মকারের কাছে ছুটতে বলল।

জিপের মধ্যে বসে দিনেশ সিগারেট ধরাল। কান্তি আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছিল দিনেশকে। ওই দিনেশের জীবন শুরু হয়েছিল স্কুলের কেরানীগিরি করে। সেখান থেকে হল ডেকরেটারের দোকান। তারপর হল চুন সুরকির, তারপর হল রঙটঙ, কলের মুখ, স্যানিটারী মালমশলার, তারপর লোহা লক্কড়ের। এটা হল দিনেশের নিজের ব্যবসার কথা, কেমন করে দিনেশ পালটাচ্ছে তার চোখে দেখা ইতিহাস। ভেতরের কথা অন্য রকম। সেখানে দিনেশের বেনামা কারবার আছে, কাপড়ের গাঁট সরাবার কেচ্ছা আছে, রেলের লোকো শপের ছাই সাফের ঠিকাদারির পার্টনারশিপ আছে, আবার নেতা হবার মজার মজার ইতিহাস আছে। শালা একবার, চৌরাস্তার মোড়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছিল এক রাত। এই দিনেশকে কান্তি অনেকবার বাবার কাছে কুত্তার বাচ্চার মতন কেঁউ কেঁউ করতে দেখেছে। তবে হ্যাঁ, লোকটার একটা গুণ আছে, মেয়েছেলের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। বিয়ে করে নি। বেটা ব্রহ্মচারী।

কান্তির বেশ মজা লাগছিল। দিনেশ সামনে গাড়িতে বসে, গোপাল পেছনে। সাকরেদ দুটো নিমতলায় দাঁড়িয়ে গা বাঁচাচ্ছে, ওর মধ্যে একটা আজকাল দিনেশের গাড়ি চালায়। বেটাদের সাধ্য নেই বৃষ্টির মধ্যে দিনেশের পাশে গাড়িতে বসে থাকে। শালা ত্রিদিবও দিনেশের সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। অফিস ঘরে ছাতা থাকা সত্ত্বেও নিয়ে যাবার সাহস করে নি। বিলাস কোথায় সরে গেছে দেখা যাচ্ছে না।

দরোয়ান গাড়ি ডাকতে গেছে ফিরছে না। দিনেশ ছটফট করছে। তার সাকরেদরা কিছু যেন করার নেই বলে ত্রিদিবকে নিয়ে তামাশা করছে মাঝে মাঝে।

একজন বলল, "দিনেশদা, আমাদের মদনাকে এখানে লাগিয়ে দেওয়া যায় না?"

দিনেশ বলল, "মদন? কোন্ মদন?"

"পলুর শালা।"

"ও, আচ্ছা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা লাগিয়ে দেওয়া যায় বই কি!" বলেই দিনেশ ত্রিদিবকে উদ্দেশ করে বলল, "আপনার কারখানায় ক'জন কাজ করে?"

"তিনজন মিস্ত্রী, একজন দরোয়ান।"

"মা-ত্ত-র! আরে সর্বনাশ, এত পয়সা করেন কি! সব বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সিন্দুকে ভরেন। মাবোয়াড়ীকেও হার মানালেন আপনারা! একেই বলে বাঙালী! সেলফিশ, শুধু নিজের চিন্তা, নিজের সুখ।...যাক্ গে, ওসব কথা পরে হবে। গাড়ি কই?"

ত্রিদিব নিজেও উদ্বিগ্ন। কি যেন বলতে বলতে ফটকের দিকে ছুটে গেল।

কর্মকারের গাড়ি এসে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দিনেশরা নামল। দিনেশের সেই ড্রাইভার জিপটাকে গ্যারেজের মধ্যে ঠেলে তুলিয়ে দেবার সময় কান্তি খুঁটির পাশ ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

কর্মকারের গাড়ির মধ্যে দিনেশরা ঢুকে বসেছে, তার জিপের ড্রাইভার এসে সামনের দিকে বন্ধুর পাশে বসল। ত্রিদিব কর্মকারের কানের কাছে মুখ নীচু করে কিছু বলে দিল।

কান্তি এবার আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। দিনেশ দেখতে পেল। কান্তিও দেখল: দিনেশ আর গোপাল পাশাপাশি বসে। গোপাল কান্তির দিকে তাকাল।

দিনেশের গাড়ি চলে যাবার পর ত্রিদিব হন হন করে অফিস ঘরের দিকে যাচ্ছিল। কান্তি তার কাঁধ ধরে ফেলল। "কি হল রে?"

কান্তির হাত কাঁধ থেকে ঝাপটা মেরে নামিয়ে দিয়ে ত্রিদিব খেঁকিয়ে উঠল। "ছেড়ে দে শালা।"

কান্তি হোহো করে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে কোমর নুইয়ে যেন হাসির দমক সামলাতে মরে যাচ্ছে, হাঁটুতে হাত চেপে বলল, "তোকে শালা পাইপ দিয়ে গেল তো?"

ত্রিদিব কোনো জবাব না দিয়ে অফিস ঘরে ঢুকে গেল।

কান্তি তখনও হাসছে, নেশার হাসি হতে পারে, নাও পারে। শেষে সেও অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকল। ত্রিদিব তার টেবিলের সামনে বসেছে, চেয়ারটা বাঁকা করে। সারা মুখে বিরক্তি, রাগ, ক্ষোভ। রুমাল দিয়ে দিয়ে মাথা মুছছিল।

কান্তি বলল, "বেশ তো ম্যানেজ করলি।"

ত্রিদিব নিরুত্তর; মুখটা মুছতে লাগল। গায়ের জামাটামা ভিজেছে কিছুটা।

টেবিলের কোণে গিয়ে বসল কান্তি পা ঝুলিয়ে। "দেখ, বিনি ঝামেলায় কেমন কাজ হয়ে গেল। দিনেশের গাড়িও থাকল, তারাও চলে যেতে পারল।" ঠাট্টা করে বলল কান্তি।

ত্রিদিব খেপে উঠে বলল, "আমার বাঁশ করে গেল। কর্মকারের গাড়ির পুরো ভাড়া আমায় দিতে হবে।"

কান্তি সেটা বেশ বোঝে; তবু বদমাইশি করে বলল, "দিনেশ তোকে ভাড়া দিতে বলল?"

"খচড়ামি করিস না।...পাক্কা কুড়ি-পঁচিশটা টাকা গলে গেল। কতক্ষণ গাড়ি আটকে রাখবে কে জানে! তার ওপর মাইল চোদ্দর আসা-যাওয়া, আরও কোথায় ঘুরবে গড্ নোজ।"

"তুমি শালা উজবুক নও। গাড়ি সারাবার নাম করে ওই পঁচিশ উসুল করে নেবে।"

"উসুল—! তুমি চাঁদ দিনেশ রায়কে কতটুকু চেন?"

"কেন?"

"গাড়ি সারাবার খরচা দেবে দিনেশ? লিডার দিনেশের গাড়ি মেরামতি করে টাকা নেবে তুমি!" ত্রিদিব যেন কতই আজগুবি কথা শুনছে এমন ভঙ্গি করে বলল। তারপর নাক দিয়ে শব্দ করল বিচিত্র রকম।

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে কান্তি হাসছিল। হাসতে হাসতেই বলল, "লোকের মেরে মেরে অনেক পয়সা করেছ শালা, দিনেশ এবার তোমায় মারছে।"

ত্রিদিব বলল, "আমায় মারছে আর তোমার বেটা মহা আনন্দ।"

"দুঃখু হতে যাবে কেন! তুমি শালা ত্রিদিব ভাদুড়ি বাপের পাতা বিছানায় আরামসে শুয়ে আছ, শুয়ে শুয়ে কামাচ্ছ, খাচ্ছ-দাচ্ছ, বউকে নিয়ে কলকাতা, পুরী, ওয়ালটেয়ার করছ, তোমার জন্যে চাঁদ আমার দুঃখ হতে যাবে কেন?"

ত্রিদিব বলল, "তোমার বাপের তো আরও বড় পাতা বিছানা পড়ে আছে, তুমি বাপ্‌তো তার ওপর শুয়ে পড়লেই পার। যাও না, শালা। যাও।"

কান্তি বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। কথা বলল না।

ত্রিদিব টেবিলটা গুছিয়ে নিল। চাবি দিল ড্রয়ারে। ঘরের মধ্যে খুটখাট শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ হচ্ছিল না। কথাবার্তা বলছিল না কেউ। ত্রিদিব আলমারি আর সিন্দুকটা টেনেটুনে দেখে নিল।

"নে চল—" ত্রিদিব বলল।

কান্তি উঠে দাঁড়াল।

সিগারেট ধরালো ত্রিদিব, কান্তিকে দিল।

বাইরে এসে দারোয়ান শিউশরণকে ডাকল ত্রিদিব। "আমি চললাম। কাল বড় মিস্ত্রী এলে প্রথমে জিপগাড়িটা দেখতে বলবে।"

গ্যারেজের ফটক পেরিয়ে এসে ত্রিদিব বলল, "আমি বাড়ি যাব। তুই?"

"কটা বেজেছে?"

ঘড়ি দেখল ত্রিদিব। "সাতটা বাজে।"

"তুই যা। আমি একটু ঘুরে যাই...।"

"যা, তোর তো যাবার জায়গা রয়েছে..." ত্রিদিব একটু হাসল। "কাল একবার আসিস। দিনেশের ওটা একবার দেখ তুই। রোজ রোজ এ ঝামেলা আমার আর পোষায় না।" দিনেশ পা বাড়াল। "চলি—।"

দিনেশ চলে যাবার পর কান্তি সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর বৃষ্টি নেই। পাঁক আর কাদার গন্ধ উঠছে। চারপাশে তাকাল কান্তি। এ দিককার দোকান-পত্র সবই কোনো না কোনো ধরনের ছোট কারখানা, কিংবা আড়ত। মোহন ট্রান্সপোর্ট অফিসের মাথায় নিয়ন লাইট জ্বলছে, দুটো বিশাল বিশাল ট্রাক দাঁড়িয়ে।

আস্তে আস্তে রাস্তার ওপারে এসে দাঁড়াল কান্তি। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। অন্যমনস্ক। কোথায় যাবে? মিলি এখন বাড়িতে আছে কিনা বলা মুশকিল। বাইরে বাজারটাজারে সিনেমাতেও যেতে পারে। বলেছিল, বৃষ্টি-বাদলা না থাকলে সন্ধ্যের দিকে একটু বেরুবো। বৃষ্টি যা আছে তাতে মিলি বেরুলেও বেরুতে পারে। কান্তি কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। এমন সময় একটা ফাঁকা সাইকেল রিকশা দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকল, 'অ্যা-ই'।

রিকশা এসে দাঁড়াল।

উঠে বসল কান্তি।

"কোথায় যাব, বাবু?"

প্রথমটায় কিছু বলতে পারল না কান্তি, তারপর বলল, "চল না, যে দিকে হোক চল। বাজারের দিকে যাস না। ফাঁকায় চল।"

রিকশাওলা কান্তিকে কিছু কিছু চেনে। মুখ ঘুরিয়ে নিল রিকশার।

শহরের এ দিকটায় লোকবসতি সামান্য, বেশির ভাগটাই ব্যবসাপাটি। কাঠ-কল, মারোয়াড়ীদের গুদোম আর গদি, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, লোহার টুকটাক কাজ করার কারখানা, টায়ারটিউব সারাইয়ের দোকান, সাইকেল স্টোর্স। খানিকটা এগিয়ে মোটামুটি নিরিবিলি, একটা ডেয়ারী চালু হয়েছে তার পাঁচিল দেওয়া কম্পাউন্ড, দু-পাঁচটা বাড়ি। তারপর ফাঁকা মাঠ, ঝোপঝাড়।

কান্তি আকাশের দিকে তাকাল একবার, মেঘ রয়েছে। রাস্তার আলোর সীমানা প্রায় শেষ, এরপর অন্ধকার। বাঁদিকে অনেকটা তফাত দিয়ে রেল-ইয়ার্ডের আলো, সিগন্যালের লাল নীল বাতি চোখে পড়ে।

একটু হেসে পা ছড়িয়ে প্রায় চোখ বুজে কান্তি রিকশার মধ্যে আরাম করে বসল। রাস্তা ভিজে; রিকশা চলার একটা চমৎকার শব্দ উঠছিল।

চোখ বুজে, পা ছড়িয়ে, গা হেলিয়ে বসে থাকতে থাকতে, অন্ধকারে, রিকশার চাকার একটানা শব্দ শুনতে শুনতে, ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাকে কান্তির কেমন ঝিমুনি এসে গেল। যতবার কোনো গাড়ির আলো চোখে-মুখে পড়ছে, ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠছে কান্তি। কী মনে করে রুমালটা বের করে মুখের ওপর চাপা দিল।

"অ্যা-ই!" কান্তি রিকশাঅলাকে ডাকল।

সাড়া দিল রিকশাঅলা।

"ঝিলের দিকে চল। এ শালার রাস্তায় যাওয়া যায় না।"

রিকশাঅলা আবার মুখ ঘোরালো রিকশার। খানিকটা পিছিয়ে এসে বাঁ হাতি রাস্তা নিল।

এই পথ বড়ই নিরিবিলি। কাঁকরের রাস্তা। দু' পাশে ঝাঁকড়া-মাথা গাছ আর বনতুলসীর ঝোপ; মাঝে মাঝে তারের ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা বাংলো বাড়ি, বাগান, লতানো গাছ। বাংলোর বাইরে বাতি জ্বলছে, বাঘের মতন কুকুর ডাকছে এক-আধটা। রেলের বড় বড় অফিসারদের বাংলো এ পাশটায়। এক সময় খাস সাহেবসুবো অফিসাররাই থাকত এদিকে; এখন যত পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী। দু'-একটা খুচরো বাঙালীও রয়েছে। শহর যতই উপচে পড়ুক, থিকথিকে হয়ে যাক ম্যাকফাবসান রোডের এপাশে আজও সব ঝিমঝিমে, নির্জন, স্তব্ধ। তবু আগের সেই চেহারা নেই; এখন আর অত চমৎকার দেখায় না। রাস্তার টিমটিমে বাতি, নুড়ি বিছোনো পথে খানাখন্দ, সন্ধ্যে থেকে চৌকিদার ঘোরে না আর।

রিকশা একটা পাক খেয়ে অন্য পথ নিল। কান্তি মুখের ওপর থেকে রুমাল সরিয়ে নিয়েছিল। অনেক জোনাকি এদিকে, ঝিঁঝি ডাকছে, বনতুলসীর গন্ধ বর্ষার ভিজে বাতাসে ঘন হয়ে আছে।

চোখ বুজে থাকল কান্তি। তার কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। এই রাস্তায় এক সময় সে, মণি আর টুনু সাইকেলে করে খুব ঘুরে বেড়াত। ছেলেবেলার কাণ্ড সব। সিগারেট খাবার জন্যে রোজ বিকেলে এতটা আসা হত ঠিকই, তবু শুধু লুকিয়ে সিগারেট খাওয়াই তাদের কাজ ছিল না। সাইকেলের কসরত শিখত এখানে; নানা রকম হাসি-তামাশার গল্প করত; আরও কত কি হত। মণি কোথায় চলে গেছে, কে জানে! টুনু এখন ধানবাদে রেলের ডাক্তার।

কান্তির চোখের পাতার তলায় কৈশোরের অনেক টুকরো ছবি ঘোড়দৌড়ের মত ছুটে এল, আবার মিলিয়ে গেল। কোনো ছবিকেই ধরে রাখা যায় না। এল আর চলে গেল। তবু কান্তি যেন নিজের কৈশোরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয় দেবার মতন করে হাসল।

"বাবু?"

"উঁ!"

"বাঁয়ে দিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

রিকশাটা আর জোরে চলতে পারছিল না। ধীরে ধীরে যাচ্ছিল।

কান্তি ঝিমোতে লাগল। ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়ল যেন।

রিকশাঅলা কতটা পথ এগুলো কান্তিকে আরও কতবার ডেকেছে তার খেয়াল নেই। খেয়াল হল রিকশাঅলা যখন নেমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছে।

কান্তি তাকাল। "কি রে?" বলে চারপাশ তাকাতেই সে চমকে উঠল। একেবারে মহুয়াবাগানে এসে গেছে।

এখানে কি করে এল কান্তি বুঝতে পারল না। পরে বুঝল, রিকশাঅলা তাকে বাড়ির কাছে এনে দিয়েছে।

রেগে গিয়ে কান্তি বলল, "আমি তোকে এখানে আসতে বলেছিলাম?"

"আজ্ঞে, আমি পথে কতবার শুধোলাম, সাড়া পেলাম না।"

"এটা ঝিলের রাস্তা?"

"ঝিলের দিকে যাওয়া যাবে না বাবু, পথ জলে ভেসে আছে।"

কান্তি বিরক্ত হচ্ছিল খুব! শালা রিকশাঅলাটা তাকে মহুয়াবাগানে ঢুকিয়ে দিল। কি ভেবে কান্তি বলল, "তা হলে ফিরে চল। বাজারের দিকে।"

অনেকক্ষণ রিকশা চালিয়ে লোকটার পা ব্যথা করছে। একটু জিরিয়ে নিতে চায়।

কান্তি বলল, "আচ্ছা, জিরিয়ে নে। আমি ফিরব। পালাবি না।"

রিকশা থেকে নেমে পড়ল কান্তি।

মহুয়াবাগান বর্ষার রাত্রে ধোয়া ছবির মতন হয়ে আছে। বাহারী নতুন নতুন বাড়িগুলোর গা দিয়ে কাঁচা সিমেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। আধ-খাপচা বাড়ির এপাশে-ওপাশে চুন সুরকি ইঁটের গাদা, খোয়া।

কয়েক পা এগিয়ে গেল কান্তি। ওই তো 'সুধাস্মৃতি'; শচীন লাটের বাড়ি।

কান্তি যেন ঝিমুনি কাটিয়ে নেবার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল। মহুয়া-বাগান চুপচাপ। বাড়িঘরের জানলার কাচের ভেতর দিয়ে সাদাটে আলো ছড়াচ্ছে এপাশে-ওপাশে; মুখার্জি স্টোর্সের দোকানটা খোলা। হালকা সুরে রেডিয়ো বাজছে কোথাও। একটা গাড়ি শম্ভু ডাক্তারের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। মাটি, বাগান, চুন-সুরকি, বৃষ্টি—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক গন্ধ এখানে।

কান্তি 'সুধাস্মৃতি'-র ফটকের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। দোতলার দক্ষিণ দিকের বড় ঘরের জানলা বন্ধ, ব্যালকনিতে আলো এসে পড়েছে, নরম আলো। ওটা বাবার ঘর। কান্তি এখান থেকেই চমৎকার ঘরের মধ্যেকার পুরো ছবিটাই যেন দেখতে পাচ্ছিল। বিশাল ঘর, মস্ত একটা পালঙ্ক, পুরু নরম গদির ওপর শচীন মজুমদার শুয়ে আছে। খাটের মাথার দিকে বালিশ উঁচু করে

তোলা। শচীন মজুমদার ঘাড় মাথা বালিশে উঁচু করে শুয়ে আছে যে তাতে সন্দেহ নেই। তার পরনে মিহি ধুতি, গায়ে নরম গেঞ্জি কিংবা মিহি কাপড়ের ফতুয়া। লোকটার মুখ দেখা কষ্টকর নয় কান্তির পক্ষে। টিয়াপাখির মতন নাক, ডগা অল্প বাঁকানো, ভীষণ বুদ্ধিমানের মতন চোখ, ধূর্ত অথচ গম্ভীর, গাল বসে গেছে, মাথায় সাদা চুল, দুটো লম্বা লম্বা রোগাটে হাত বুকের কাছে। শচীন মজুমদারের পুরো চেহারায় মানুষটার পেশাদারী মহিমা আছে। ওই লোকটা যে এক সময় সুপুরুষ ছিল এ যেমন স্বীকার করতে কষ্ট হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়—শচীনের আভিজাত্য এবং অহমিকা তার চামড়ার ওপর মাখানো আছে। ব্যক্তিত্ব এত প্রখর যে ভয় লাগে মানুষটাকে।

বাবার ঘরে কান্তি খুব কম যেত। যেত না বললেই চলে। যখনই গিয়েছে বাবার ঘরের দামী, শৌখিন, ভারী আসবাব-পত্রের আশপাশ থেকে যেন কত রকমের ডাকাত, খুনে, শয়তানদের মুখ কান্তিকে দেখছে এই রকম মনে হত, বাবার ঘরে তাদের নিঃশ্বাস পড়ছে এমন একটা ধারণাও কান্তির ছিল হয়ত। অথচ বাস্তবিক শচীন মজুমদার একা সেই ঘরে কী আরামে থাকত। দুটো ঝকঝকে পাখা, দশ-বারোটা নানা রকমের আলো, গদি-মোড়া আরাম-চেয়ার, বিশাল আয়না, এক গাদা কুশন, মোটা মোটা সুন্দর পরদা, ঘরের বাতাস সুগন্ধ করার ওষুধ, আরও অজস্র ভোগসুখের সামগ্রী নিয়ে শচীন লাট লাটের মতন থাকত। নানা ধরনের ওষুধপত্র ছাড়াও বাবার ঘরে দামী মদ, সোডা এটা-ওটা বরাবর ছিল।

আজ সেই শচীন মজুমদারের অবস্থা দেখো। বুড়ো বিছানায় শুয়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়। উঠে দাঁড়াতে হলে তাকে লোক ডাকতে হয়, তলায় রবার-দেওয়া-ছড়ি নিতে হয় বাঁ হাতে, আস্তে আস্তে পা টেনে টেনে যেতে হয়। তবু তার কাছে মক্কেল আর উকিলরা আসে এখনও। শোবার ঘরের পাশে একটা ঘর রয়েছে, সেখানেই এদের সঙ্গে কিছু কথা বলে। ঘরটায় শুধু আইনের বই। ঠাসা। আর কাগজপত্র। দেওয়ালে মা-কালীর এক পট, বিরাট পট, সোনালী ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো।

শোবার ঘরে বাবার মাথার কাছে ছোট একটা র‍্যাক, তাতে খুচরো জিনিস থাকে, ঘড়ি, চুরুট, লাইটার, এলাচ-লবঙ্গর কৌটো, দু-একটা বই। শচীনের মাথার কাছে কান্তি গীতাটীতাও দেখেছে। ধর্ম করছে শচীন মজুমদার। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে...। করে যা লাট, করে যা—ধম্ম করে যা এই বুড়ো বয়েসে। ভাগবৎ-টাগবৎ শোন্।

কিন্তু কে শোনাবে ভাগবৎ, কাকে ডেকে তুমি পড়তে বলবে বুড়ো? বলো না—কে তোমাকে পড়ে পড়ে শোনাবে?

কান্তি ফটকের গায়ে হাত দিল। এবং নিজের অজান্তেই খুলে ফেলল।

সিমেন্টে বাঁধানো এক ফালি পথ; ডানদিকে লন, রঘুমালি রোজ বাগানে কাজ করে। বেলফুলের ঝাড়। নরম গোছের আলো এসে পড়েছে পথে। বাড়িটা

চুপচাপ, স্তব্ধ।

এই বাড়িতে কান্তি আজকাল আর আসে না। দু'-একবার একেবারে দায়ে পড়ে আসতে হয়েছে, চোরের মতন। আজও সে চোরের মতন এল। কুকুর নেই ভাগ্যিস, থাকলে চেঁচাত।

কুকুর নেই, কোনো মক্কেল বা উকিলও নেই, থাকলে গাড়ি দেখা যেত বাইরে, অন্তত দোতলার বাবার বসার ঘরে আলো জ্বলত। আজ কেউ আসে নি। বাবা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে পিঠ মাথা উঁচু করে। কিংবা গদিমোড়া আরাম চেয়ারটায় বসে আছে চারপাশে কুশন সাজিয়ে। বাবার পাশে, হাতের কাছেই মাপ করা হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস, চুরুটের কেস, ছাইদান, লাইটার। শচীন মজুমদার কোনো কালেই মাতাল হবার জন্যে মদ খায় না, নেশার চোটে কাঁচাকোঁচা খুলে যাবে, টলে মুখ গুঁজে ন্যাংটো হয়ে পড়ে যাবে—এসব তার নেই। কয়েক টুকরো নরম মাংস, ভাল মাছের দুটো টুকরো, খাঁটি গরুর দুধ—এইসব যেমন বাবার নিত্য খাদ্যবস্তু, নিজের শরীর-স্বাস্থ্য মজবুত রাখার জন্যে বেছে নেওয়া, সন্ধ্যের দিকে মদ্যপানটাও সেই রকম। আগের চেয়ে এখন পরিমাণ আরও কমে গেছে, ডাক্তারের কথা মতন মাপা দাগে চলে এসেছে। বাবা, ডাক্তারদের কথা মান্য করে খুব—বিশেষ করে বাবার বন্ধু কিশোরীলাল মিত্তির যা বলে তার চেয়ে এক চুল এদিক-ওদিক নড়ে না।

বাবা বিছানায় শুয়ে থাকুক, কিংবা আরাম-চেয়ারে বসে থাকুক, এখন রানী বাবার কাছে। বাবা শুয়ে থাকলে রানী বাবার মাথার পাশে বসে মোটা ভাগবত পড়ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ—বাবা, রানী ফালতু মেয়েছেলে নয়, গড়গড় করে বাংলায় ভাগবত পড়তে পারে। বাবা হুইস্কি এবং ভাগবত দুই-ই একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। গীতাটীতা হলে বাবা নিজেই পড়তে পারে, ছিমছাম বই গীতা, বাবার পক্ষে নিজে হাতে নিয়ে পড়া সম্ভব। ভাগবত শালা বড় গোবদা। বাবার ডান হাত একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে, বুকের ওপর ভাগবত ধরে রাখা বাবার সাধ্য নয়। যদি বাবা বিছানায় না শুয়ে আরাম-চেয়ারে বসে থাকে—তা হলেও এখন কী কী হচ্ছে কান্তি বেশ দেখতে পাচ্ছে। বাবার পাশে চেয়ার টেনে রানী বসে আছে। রানীর গায়ে শান্তিপুরী অথবা ফরাসডাঙ্গার শাড়ি, সাদা খোল, পাড়ের রঙ হয় কুচকুচে কালো, না হয় ঘন খয়েরী। গায়ে পাতলা সাদা ব্লাউজ, মলমল টলমলের হবে, জামার গলায় মিহি লেস। রানী ব্লাউজের তলায় কিছু পরতে পায় না। বাবার কাছে ওসব চলবে না, জামার তলায় বাঁধাবাঁধি করতে পারবে না। মাথা একেবারে খোলাখুলি রাখাও বাবার পছন্দ নয়, কাজেই রানীকে মাথায় সামান্য কাপড় দিতে হয়। কাপড় অবশ্য থাকে না, ঘাড়ের কাছে নেমে আসে, রানীর মোটাসোটা, বড় কালো খোঁপাটা দেখা যায়। রানীর চুল নিয়ে যত্ন আছে, তার কপালের দিকে দু'-পাঁচটা চুল যে সাদা হয় নি তাও নয়, কিন্তু সামনে যাবার আগে রানী তা তুলে ফেলে। অপরিষ্কার কিছু রাখা রানী পছন্দই করে না, তার গায়ে লোমটোম দেখাই যায় না।

বাবার পাশে রানী একটা মাদি বেড়ালের মতন বসে আছে। ফরসা, গোল-গাল, পেটে দু'-চারটে বাচ্ছা নিয়ে বসে থাকা বেড়ালকে যেমন দেখায় অবিকল সেই রকম। শালা, কী আদুরে, সোহাগী বেড়াল রে! রানীর চেহারাও যেন অনেকটা ওই রকমই; গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা, গোলগাল ফুলন্ত শরীর, হাত-পা থলথলে, মুখের আদলও গোল, টসটসে ফোলা ঠোঁট, নাকের ডগা মোটা. কপাল ছোট, বসন্তর দু'-একটা দাগ গালে আর থুতনিতে, বেঁটে বেঁটে দাঁত, পান-জরদার ফিকে ছোপ লেগেছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, ভীষণ সাবধানী আর চালাকি দৃষ্টি ওর। রানী বোকা নয়, নির্বোধ নয়। বাবার পাশে বসে সে শচীন লাটের হাতে-পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্পই করছে হয়ত। লাটের মুখ দেখছে, ভঙ্গি লক্ষ করছে যত্ন করে। আর থলথলে, আদুরে, অলস, আরাম পাওয়া শরীর নিয়ে বাবার গাত্রসেবা করছে।

কান্তি প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিচের হলঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। চাকর-বাকররা সব ভেতরে। নন্দটাকে কাছাকাছি দেখতে পেলে মন্দ হত না। কান্তির ঘরে গিয়ে কিছু আনা অন্য কেউ পারবে না। তার ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া কি না কে বলতে পারে। হয়ত রানী চাবির গোছাটা নিজের কোমরেই রেখে দিয়েছে। অসম্ভব নয়। আগের বার বাড়িতে এসে রানীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। আররে শালা, সে এক ফ্যাসাদ। সিঁড়ির মুখে নীচে দেখা হয়ে গেল। রানী বোধ হয় বাবার জন্যে কিছু হুকুম করতে একতলায় নেমেছিল। রান্নাঘরের দিক থেকে ফিরছে, আর কান্তি ঠিক তখনই বাড়ি ঢুকেছে। চোখাচুখি হতেই দু'জনে যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে পড়ল। রানী তাকে দেখছিল; কান্তিও দেখছিল রানীকে। কান্তি স্পষ্ট দেখতে পেল রানীর মুখে ভয়, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা সব মিলে মিশে একাকার এক ভাব হল। কেউ কোনো কথা বলল না। হঠাৎ রানী তার ভারী, ফোলানো, ঝালরের মতন শরীর নিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে তরতর করে সিঁড়ি উঠতে লাগল। তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল, অত ভারী গতর নিয়ে পালাবার মতন শব্দ।

একেবারেই আচমকা দোতলার ব্যালকনিতে বাতি জ্বলে উঠল। সাদা, উজ্জ্বল আলো। চমকে উঠে কান্তি লাফ মেরে অন্ধকারের দিকে সরে গেল।

রানী। রানী ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রিলে হাত রেখে মুখ-বুক ঝুঁকিয়ে পানের পিক ফেলছে। বর্ষার বাতাসে রানীর শাড়িটাড়ি ফুলে ফেঁপে যাচ্ছিল। পিক ফেলল রানী, দাঁড়িয়ে থাকল, বাগানটাগান, ফটক, বর্ষার আকাশ, মেঘ, আবহাওয়া দেখছিল যেন। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে রঘুমালিকে ডাকতে লাগল। ফটক খোলা।

কান্তি ফটকটা খুলেই এসেছিল। তার মনে হয় নি সে ফটক খোলা রেখে এসেছে।

রঘুমালি বোধ হয় রানীর গলা শুনতে পাচ্ছিল না।

টগর গাছটার তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কান্তি। সামনে, পাশে কোনো-

দিকেই তার ছুটে যাবার উপায় নেই, রানী দেখতে পাবে। এক সে পেছন দিকে পালাতে পারে, পেছন দিকে বাগান, অন্ধকার, মালির ঘর, গ্যারেজ। সামনের দিকে যাওয়া যাবে না দেখে কান্তি পেছন দিকে পালানোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। শালা, এইভাবে পেছন দিয়ে পালানোই কি তার কপাল নাকি? রানী তখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কান্তি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'মাগী কাঁহাকা।'

পাঁচ

কান্তি হাত সরিয়ে নিচ্ছিল। মিলি ধমক দিয়ে বলল, "ন্যাকামো করো না, কচি খোকা।"

হাসল না কান্তি, নাক মুখ কুঁচকে যন্ত্রণার ভান করল।

বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটা স্পিরিটে ধুয়ে মুছে তুলোয় করে একটু বেঞ্জিন দিয়ে দিল মিলি। আয়োডিন নেই, ফুরিয়ে গেছে। কান্তি এবার হাত টেনে নিয়ে বলল, "আর কিছু করবে না? একটা ব্যাণ্ডেজ-ফ্যাণ্ডেজ?" ঠাট্টা করেই বলল কান্তি।

মিলি বলল, "কোথায় মাতলামি করতে গিয়েছিলে?"

"মাতলামি! আমার হাত-পা ছড়লেই মাতলামি?"

"ওদিকের গালটায় কালশিটে পড়ল কি করে?"

কান্তি ডান হাতটা বাঁ দিকের গালে চোখের তলায় আস্তে করে ছোঁয়াল। বলল, "সাইকেল থেকে এমন করে পড়লাম, একেবারে ছিটকে। একটা বাচ্চা যে কোথা থেকে বোঁ করে ছুটে এল, বেটাকে বাঁচাতে গিয়ে সোজা নালায়, আর-একটু হলে নর্দমায় ডুবে যেতাম।"

মিলি যেন খোঁচা মেরে বলল, "নর্দমায় ডুবতে বাকি আছে নাকি।"

কান্তি কিছু বলল না, যেন কথাটা কানে শুনতেই পায় নি। বেঞ্জিনের গন্ধ উঠছিল। হাতটাকে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল কান্তি বেঞ্জিনের।

ঘরে বাতি জ্বলছিল। পাখাও চলছে। আজ আর বৃষ্টি নেই। জানলা খোলা। দূরে রামসীতার মন্দির থেকে একটা ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।

মিলি বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ। তার গা ধোওয়া, কাপড় ছাড়া, চা খাওয়াও শেষ। সকালের দিকে নিচের বুড়ীর জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়েছে। বুড়ীর হঠাৎ এমন বুকের যন্ত্রণা শুরু হল যে ডাক পড়ল মিলির। বর্ষা বাদলায় জ্বর যাচ্ছিল বুড়ীর, সাধারণ ব্যথা, কাশি কিংবা টান থেকে হয়েছে। হাসপাতাল যাবার সময় তাড়াহুড়োয় কোনো রকমে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে মুখে গুঁজে মিলি বেরিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। বাড়ি ফিরে ক'টা রুটি সেঁকাও শেষ করে মিলি ডিমের কারি বসিয়েছিল। প্রায় হয়ে এল।

হাত ধোয়ার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল মিলি, কান্তি বলল, "পায়ে একটু চুন হলুদ লাগাতে পারলে হত।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মিলি। "পায়ে কেন, মুখে লাগাও। লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও।"

কান্তি হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে মনে হল, চুনকালির বদলে মুখে চুন হলুদ লাগানো মন্দ নয়। মিলি ততক্ষণে চলে গেছে। ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসে বসেই কান্তি পা নাড়াল, পায়ের দিকে ঝুঁকে হাত বুলিয়ে গোড়ালিটা দেখল। খানিকটা টনটন করছে। চোট লেগেছে বেশ। মচকে ফচকে যেতে পারে। অল্প একটু ফুলেছে। রাত্রে বোঝা যাবে। হাঁটবার সময় কষ্টই হচ্ছিল। চুন-হলুদ লাগাতে পারলে দারুণ হত। কান্তি খেলাধুলো কম করে নি। স্কুলে সে পয়লা নম্বর ফুটবলার ছিল; কলেজে ক্যাপ্টেনগিরি করেছে। এখানকার 'গ্রীন ক্লাব' তার হাতে তৈরী, ক্লাব নিয়ে সে কত টুর্নামেণ্ট খেলে এসেছে। হাত পায়ের জখম তার কাছে নতুন নয়, বাঁ হাতটা তো একবার ভেঙেই গিয়েছিল, কব্জির কাছে, মাথায় অজস্র চোট, পায়ে অসংখ্য কাটকুটির দাগ। ছোটখাটো চোটে যে যতই বলুক চুনহলুদ সাংঘাতিক। মিলির বাড়িতে গুঁড়ো হলুদ পাওয়া যাবে, কিন্তু চুন? চুনও বাইরে বেরুলে পাওয়া যায়। কিন্তু যাবে কে? কান্তিরই ভুল হয়ে গেছে, এখানে আসার সময় খানিকটা চুন পানের দোকান থেকে নিয়ে এলেই হত।

গায়ের জামাটা খুলে ফেলল কান্তি। নালার কাছাকাছি ছিটকে পড়ায় নোংরা-টোংরা লেগেছে। একেবারে বোকার মতন সাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়েছিল কান্তি। ছেলেটার দোষ ঠিকই, কিন্তু কান্তি যদি অন্যমনস্ক না থাকত, সে নিজেকে বাঁচাতে পারত। সাইকেল-টাইকেল আর চড়া যায় না। সুবলের সাইকেলটাও একেবারে লজঝড় মার্কা, শালার যেমন সিট, তেমনই ব্রেক।

মিলি ফিরে এল।

কান্তি বলল, "বেচুবাবু লোকটা বড় অপয়া। ওর কাছে গেলেই একটা না একটা কিছু হবে।"

"আজ গিয়েছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল কান্তি।

"আজ আবার কার শ্রাদ্ধ বলল?"

"আমার।"

মিলি কান্তিকে স্থির চোখে দেখল। বলল, "তোমার আবার নতুন করে শ্রাদ্ধ হবে? একবার তো হয়েই গেছে।"

"আমার ব্যাপারস্যাপারই আলাদা; একবারে আমার কি হয়, কান্তি মজুমদার তোমার মতন ফালতু লোক নয়," কান্তি হাসল।

মিলি বলল, "তোমার মতন লোকদের শ্রাদ্ধও হয় না, ভাগাড় হয়।"

কান্তি আবার হেসে উঠল।

চেয়ার থেকে উঠল কান্তি। চোট খাওয়া গোড়ালির কাছটায় ঝন্ করে ব্যথা লাগল। চোখমুখে যন্ত্রণার ভাব করল, তারপর সাবধানে পা ফেলল। "গোড়ালিটা

মচকে গিয়েছে।"

মিলি যেন কান্তির পা ফেলা দেখে মজা পাচ্ছিল। একটু খোঁড়াচ্ছে লোকটা। বলল, "ভেঙে গেলেই পারত।"

"ভেঙে যাবে কি!" কান্তি মিলির মুখের দিকে অবাক হবার ভান করে তাকাল। "গোড়ালি ভেঙে যাবার ঝামেলা বোঝো?"

"বেশ বুঝি।"

"কিছুই বোঝ না; গোড়ালি ভাঙলে আমায় এখন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হত।"

"থাকতে।"

কান্তি দু পলক মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি মাইরি রিয়্যাল খচ্চর।" বলে হাসতে লাগল।

মিলি কিছু বলল না। না রাগ, না হাসি, তার মুখে কোনো রকম চিহ্নই নেই, বরং কান্তির খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখছিল মজার চোখেই।

কান্তি গায়ের জামাটাকে একপাশে ফেলে দিল। কাল লণ্ড্রিতে দিয়ে আসবে. প্যান্টটার অবস্থাও ভাল নয়। আলনার কাছে গিয়ে প্যান্টের বোঁতাম খুলতে খুলতে কান্তির হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, বলল, "তোমাদের হাসপাতালে জ্যোৎস্না ঘোষ বলে একটা নার্স আছে?"

মিলি কান্তিকে পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছিল। "জ্যোৎস্না—! থাকতে পারে। জ্যোৎস্না পূর্ণিমা সবই আছে। কেমন দেখতে?"

"রোগা রোগা, বেঁটে..."

"ও! বুঝেছি। তার আবার কি হল?"

"কিছু হয় নি। আজ একবার স্টেশনে গিয়েছিলাম। বিজু—মানে আমাদের বিজলীর সঙ্গে দেখা। বিজু মালগাড়ির গার্ড। বিজু বেটাকে দেখি মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। বললাম, কে রে? বলল, বউ। বিজু তোমাদের জ্যোৎস্নাকে বিয়ে করেছে।"

"সে তো অনেক দিন। মাস তিন চার হতে চলল।"

"আমি জানতাম না। আমায় কেউ জানায় নি।" বলে কান্তি একটু থামল। প্যান্টটা খুলে ফেলল। "আজকাল পুরোনো বন্ধুবান্ধবরাও আমায় কেউ কিছু জানায় না। বিজু শালা আমাদের পুরোনো বন্ধু। তার প্রথম বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। শালার বউটা বাচ্চা হতে গিয়ে যখন মরে গেল, শ্মশানেও গিয়েছি। বেটা আবার যখন বিয়ে করল একবার জানালো না।...আজকাল আমায় কেউ কিছু জানায় না। পছন্দ করে না শালারা, ইজ্জতে লাগে, ভদ্রলোকের সমাজে থাকে তো বেটারা।...শালা, খচ্চর..."

কান্তি প্যান্টটাও একপাশে ফেলে দিল। পরনে সেই ছোট, আঁট, জিনের সাদা প্যান্ট, ঊরুর কাছে কামড়ে রয়েছে যেন; গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে তোয়ালেটা পেয়ে গেল সে।

মিলি কোনো কথা বলছিল না। জ্যোৎস্না এখনও হাসপাতালে চাকরি করে। তার জেনারেল ওয়ার্ড। কখনো সখনো দেখা হয় মিলির সঙ্গে। জ্যোৎস্নার বিয়ের কথা মিলি আরও ভাল জানে, শুনেছে। বিজু না বিজলী—কি যেন নাম বলল কান্তি তার বন্ধুর, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসপাতালেই জ্যোৎস্নার আলাপ হয়। বউকে দেখাতে আসত বিজলী, রুগ্ন বউ, প্রায় একটা না একটা বেধে থাকত। তখনই আলাপ দুজনের। তারপর ভদ্রলোকের স্ত্রী বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। জ্যোৎস্না সে-সময় বিজুকে শোকেতাপে অনেক সমবেদনা জানিয়েছে। বিজলী কবে যেন জ্যোৎস্নাকে এতোই নিজের ভেবে বসল যে বিয়েই করে ফেলল। ভালবাসার ব্যাপার সব। নার্স হিসেবে জ্যোৎস্না এমন কিছু কাজের নয়, কিন্তু মেয়েটা ভাল; একেবারে গেরস্থালী মেয়ে। ভালই করেছে বিয়ে করে। জ্যোৎস্নার মতন আরও পাঁচ সাত কি দশজন আছে, যেমন মৃদুলাটুদুলা, বিয়েবাচ্চা সংসার করে হাসপাতালে কাজ করে যাচ্ছে, কেউ স্বামীর অল্প রোজগারে সাহায্য করছে, কেউ ভাইকে পড়াচ্ছে, বোনের বিয়ের খরচা জমাচ্ছে, কত কি করছে। মিলির এসব কিছু নেই। সে এদের পছন্দ অপছন্দ কিছুই করে না। করার দরকারও নেই। যে যার সে তার, তাতে মিলির কি আসে যায়।

কান্তি ঘরে নেই, বাথরুমে গিয়েছে। অন্যমনস্কভাবে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল মিলি। বাইরে, সোজা তাকিয়ে থাকলে রথতলার মাঠের বিরাট বটগাছটার ডালপালা, মাথা ছায়ার মতন চোখে পড়ে, এদিককার এক চিলতে আকাশে কেউ এক মুঠো তারা ছড়িয়ে দিয়েছে, খুব ফিকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে অন্ধকারে। আজ কী তিথি কে জানে! মিলির বাড়ির গায়ে দাশবাবুর বাড়ি, একতলা বাড়ির ছাদে এক কোণে ছেঁড়া মাদুর, পুরোনো ভাঙা খাঁচা, কাঠকুটো আরও কত হাবিজাবির একটা স্তূপ চোখে পড়ে। সরাসরি কিছুই দেখা যায় না, তেরছা ভাবে ওইটুকুই চোখে পড়ে। একটা বেড়াল কাঁদছে কোথাও। ছানা-পোনা বিইয়েছে বোধ হয়। ছেলেবেলায় মিলির একটা বেড়াল ছিল, সাদা গা খয়েরী নাক, মিলি তাকে 'টুসটুসি' বলে ডাকত: নাকের কাছে ধরে রাখলে বেড়ালটা মিলির গালে মুখ ঘষত যেন। একদিন এক হোলা এসে মেরে ফেলল বেড়ালটাকে। পশুপাখি আর পোষে নি মিলি, ভালও লাগে না তার।

গায়ের আলসামি ভাঙতে ভাঙতে মিলি ঘরের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া করে শেষে দেরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘড়িতে আটটা বাজে। কি করব কি করব করে মিলি একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল; তারপর আস্তে আস্তে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কান্তি ফিরল। পাজামা পরেছে, গায়ের গেঞ্জিটাও ফেলে রেখে এসেছে বাথরুমে। মুখ মুছে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল। খোঁড়াচ্ছে কান্তি।

"মিলি, তোমার কাছে কোনো মালিশ-টালিশ নেই?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"সেদিন কপালে কী ঘষছিলে?"

"কপালে!...ও!" মিলির যেন খেয়াল হল, বলল, "দেওয়াল তাকটা দেখো, একটা ছোট শিশি পাবে।"

কান্তি দেওয়াল তাকের দিকে সরে গেল।

সামান্য চুপচাপ। মিলি বালিশে মাথা দিয়ে, কোমর থেকে হাঁটু উঁচু করে, পা ভেঙে, ফাঁক করে শুয়ে ছিল। সিগারেটটা তার ডান হাতে। অলসভাবে শুয়ে আছে।

"বেচুবাবু কি বলল তোমায়?' মিলি জিজ্ঞেস করল আচমকা।

"বলল, আমার খবরাখবর বাবার কানে যায়।"

"লোক লাগিয়েছে নাকি?"

"লাগাতে পারে। না লাগিয়েও পাওয়া যায়। আমার খবর কে আর না জানে?" শিশিটা তুলে নিয়ে কান্তি ঘুরে দাঁড়াল। মিলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "বেচু বলছিল, আমি চাইলে একটা হাত খরচা পেতে পারি, শচীন মজুমদার দু চারশো টাকা করে দিতে পারে।"

মিলি ঠোটের ডগায় সিগারেট চেপে শুয়ে থাকল।

কান্তি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল। "আমি বেচুকে বললাম আমার হাত খরচা দরকার নেই। এক দেড়শো দুশো টাকা আমি কামিয়ে নিতে পারি।"

"তুমি সবই পার!" মিলি ঠাট্টা করে বলল।

"টাকা কামাতে পারি না?"

"পারবে না কেন, চুরি জোচ্চুরি করে পার, এর তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পার.."

কান্তি আপত্তি জানিয়ে বলল, "চুরি কে না করছে? ধম্মকথা আমায় শেখাতে এস না। আমি সব শালার ধম্ম দেখছি" বিছানার পাশে বসে পড়ল কান্তি। "টাকা রোজগারের ধান্দা আমার জানা আছে। ত্রিদিবের গ্যারেজে আমি বসলে দিনে দশ পনেরোটা টাকা ইজিলি পেতে পারি। এই শহরে চার পাঁচটা গ্যারেজ আছে জান?"

মিলি সিগারেটের টুকরোটা কান্তির দিকে বাড়িয়ে দিল। "ফেলে দাও।"

কান্তি টুকরোটা নিয়ে লম্বা করে দু-তিনটে টান মারল। মিলির সিগারেট ঘাসের মতন। বলল, "তুমি এই পেঁপে পাতার গুঁড়ো কেন টান? থার্ড ক্লাস।" বলে জানলার দিকে ছুঁড়ে দিল। মচকানো পা আস্তে করে বিছানার ওপর তুলল; অন্য পা খাটের পাশে ঝোলানো। পাজামা গুটিয়ে গোড়ালি দেখতে দেখতে কান্তি বলল, "ফুলেছে।"

মিলি শুয়ে শুয়েই পা দেখছিল কান্তির। বলল, "আগে একটু গরম সেঁক দিয়ে নাও, তারপর মালিশটা দিও, তাতে কিছু উপকার হতে পারে।"

"গরম! গরম কোথায় পাব?" কান্তি মিলির দিকে তাকিয়ে কি মনে করে

হাসল, "তোমার পাশেই যা গরম...!"

মিলি কথায় কান দিল না। বলল, "এখন রেখে দাও। আমার কাছে হট ওয়াটার ব্যাগ আছে। পরে জল গরম করে দেব।" বলেই আবার মন্ত পালটাল মিলি। "থাক, এখন যা করছ করো, পরে হট ওয়াটার ব্যাগ দিও।"

কান্তি শিশির মুখ খুলে মলম বের করল। "কতটা দেব?"

"যতটা তোমার লাগবে।"

গোড়ালিতে খানিকটা মলম দিয়ে কান্তি নরম করে ঘষতে লাগল। বলল "আজকাল বয়েস হয়ে যাচ্ছে বুঝলে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। যৌবনটৌবন যখন ছিল কত জখম হয়েছি, চোট খেয়েছি, কবে শালা কেয়ার করেছি। এখন একটু পা মচকালেই ল্যাংড়া।" বলে কান্তি নিজের মনেই হাসছিল।

মিলি পাশ ফিরল, কাত হয়ে শুলো। কান্তির পায়ের গড়ন ও রঙ চমৎকার। লোমও অনেক ঘন, বড় বড় লোম। মিলি বলল, "তোমার যৌবন বয়সটা আমার দেখা হল না—" ঠাট্টা করেই বলছিল মিলি, "বুড়ো বয়েসে আমার ঘাড়ে চাপতে এলে কেন?"

কান্তি হাসতে হাসতে জবাব দিল, "একেই বলে রক্ত, বুঝলে মিলনবালা বাপকা ব্লাড।" বলতে বলতে কান্তির রানীর কথা মনে পড়ল, বাবা আর রানী।

মিলি কান্তির চোখমুখ দেখতে লাগল। "তোমার রক্ত খুব খারাপ।"

"তোমার?" কান্তি মুখ তুলে মিলির চোখের দিকে তাকাল।

মিলি চুপ। দু মুহূর্ত কোনো কথা বলল না। তারপর বলল, "আমার রক্তও খারাপ।"

কান্তি মুখ নামিয়ে আবার মলম বুলোতে লাগল।

ঘরের মধ্যে আচমকা যেন সব কেমন নিঃশব্দ হয়ে গেল। কান্তি নীচু মুখে পায়ের গোড়ালিতে মলম ঘষছে, মিলি একেবারে অন্যমনস্ক চোখে কান্তির পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কোনো রকম শব্দ নয়, কেউ কোনো কথা বলছিল না।

শেষে মিলি উঠে বসল। বলল, "তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমার রক্ত ভদ্রলোকের বলে চলে যায়, আমার চলে না। লোকে জানে, আমার জন্মের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কুকুরবেড়ালের মতন আমি জন্মেছি।"

কান্তি মিলির গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল মিলির গলা ধারালো হয়ে উঠেছে। মুখ তুলে দেখল, মিলির মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি রুক্ষ।

কান্তি বলল, "ভদ্রলোকেরা কিভাবে জন্মায়?...আমি শচীন মজুমদারের ছেলে, ডজন ডজন ভদ্রলোক আমি দেখেছি। সে শালারা কুকুর-বেড়ালের চেয়েও নোংরাভাবে জন্মেছে।"

মিলি মাথা ঝাঁকাল। "জন্মাক। তারা যেমন করে খুশি জন্মাক। আমার কী! আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না। আমি ভদ্রলোক নই, ভদ্রলোক হব না।"

কান্তি মিলির আক্রোশ, রাগ, ঝকঝকে চোখ দেখতে দেখতে বলল, "তুমি ভদ্রলোক হয়ো না। আমিও হচ্ছি না।"

হঠাৎ মিলির কি যে হল খপ্ করে কান্তির হাত ধরে ফেলল, ফেলে হেঁচকা টানল। "তুমি আমার এখানে কেন আস?"

হেলে পড়তে পড়তে কান্তি সামলে নিল নিজেকে। মিলির এই হলো দোষ: ভাল থাকতে থাকতে হঠাৎ খেপে যায়। খেপে গিয়েছে মিলি। কান্তি হাসি মুখ করে বলল, "তোমার টানে আসি।"

কান্তিকে ধূর্ত তীক্ষ্ম চোখে দেখতে দেখতে মিলি বলল, "আমার টানে আস? মিথ্যেবাদী, শয়তান। আমার টান, না নেশার টান?"

কান্তিকে এমন করে টানছিল মিলি যে কান্তি ঠিক মতন না বসার জন্যে মিলির কোলের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। কান্তি বলল, "তুমি মাইরি এমন সব কথা বলো, কোনো মানেই হয় না। শুধু ওই নেশার জন্যে তোমার কাছে আসব!"

মিলি লাথি মারার মতন করে পা ছুঁড়ল, কান্তির পায়ের পাশে রাখা মলমের শিশিটা ছিটকে মাটিতে পড়ল, পড়ে শব্দ হল। ভাঙল, না কি হল কে জানে, মিলি চেঁচিয়ে উঠল। "তোমার মুখ দেখলে আমার ঘেন্না হয়। জানোয়ার, বদমাশ! আমার বাড়িতে তুমি আসবে না। এ শহরে অনেক আধুলিবালা কম্পাউন্ডার আছে। তাদের একটা করে টাকা দিও, তোমায় নেশা করিয়ে দেবে।"

কান্তি একেবারে চুপচাপ। মিলির মাথায় রক্ত উঠে গেলে তাকে শান্ত করার জন্যে কান্তি কখনোই ব্যস্ত হয় না। নিজেই ঠান্ডা হয়ে যাবে মিলি।

কান্তি চুপ করে রয়েছে দেখে মিলি বলল, "এ বাড়ির দরজা একদিন তোমার কাছে বন্ধ হবে। আমি করব।"

মিলি বিছানা থেকে নেমে গেল। ক্ষিপ্ত চেহারা, কেমন যেন বেহুঁশ ভাব। কান্তি মেঝের দিকে তাকাল, মলমের শিশিটা ভেঙে গেছে, মেঝেতে আঠার মতন খানিকটা মলম পড়ে রয়েছে, ভাঙা শিশি। কাঁচের টুকরো কোথায় কোথায় ছিটকে গিয়েছে কে জানে। মিলি ঘরের মধ্যে যেভাবে হাঁটাচলা করছে, পা কাটতে পারে। কান্তি বলল, "শিশিটা ভেঙে গেছে।"

ঘর থেকে চলে গেল মিলি, কান্তির কথা শুনল কি শুনল না, বোঝা গেল না।

কান্তি গোড়ালির কাছে আবার হাত ঠেকাল। মলম শুকিয়ে জায়গাটা পুরু খসখসে হয়ে উঠেছে। মলমের ঝাঁঝের গন্ধ উঠছিল। এতোক্ষণ গন্ধটা নাকে গেলেও কান্তি তেমন খেয়াল করতে পারে নি। আস্তে আস্তে আবার গোড়ালির ওপর আঙুল ঘষতে লাগল।

রাত হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। ঘর অন্ধকার। পাখাটা হু হু করে চলছে।

সামান্য গুমোট ছিল সন্ধ্যের দিকে এখন গুমোট নেই। কাল পরশুর মধ্যে আবার বৃষ্টি নামার মতন আবহাওয়া হয়ে রয়েছে ক'দিন ধরে। কখনো চড়া রোদ, কখনও মেঘলা, মাঝে মাঝে আকাশ ঘোর হয়ে এসে আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

কান্তি শুয়ে ছিল, পাশে মিলি। কান্তির পায়ের কাছে হট ওয়াটার ব্যাগটা পড়েছিল অনেকক্ষণ, সামান্য আগে সরিয়ে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে মেঝেতে।

শুয়ে থাকতে থাকতে মিলি বলল, "আমি ছুটি নেব আসছে মাসে।"

"ছুটি? তুমি ছুটি নেবে? হঠাৎ?"

"বাইরে যাব একটু।"

"কোথায়?"

মিলি কিছুক্ষণ কথা বলল না। পরে বলল, "যাব এক জায়গায়।"

কান্তি অন্ধকারে উঁচু মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "তোমার তো কেউ নেই বলো।"

"না, আমার কেউ নেই।"

"চেনাশোনা আছে।"

কান্তি মাথার ওপর আস্তে করে হাত তুলল। বলল, "তুমি না থাকলে আমারই মুশকিল।...কিন্তু হঠাৎ কোথায় যাবে?"

মিলি অনেকক্ষণ কোনো সাড়া দিল না। তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে কান্তির মনে হচ্ছিল, মিলির নেশা ধরে আসছে। আজ মিলির হাতের ঠিক ছিল না। কান্তির লেগেছে, বড় বিশ্রীভাবে ছুঁচটা ফুটিয়েছিল। নিজের বেলায় মিলি আরও যাচ্ছেতাই করল। সিরিঞ্জটা হাত থেকে ফেলে দিল, মানে পড়ে গেল। অবশ্য ওষুধটা তার আগে নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। বেশী রাগারাগি করলে, ছটফট করলে, সময় পেরিয়ে যেতে দিলে বোধ হয় হাত পায়ের জোর কমে আসে।

মিলি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় নি। কিছু ভাবছিল। বলল, "তুমি আমার সঙ্গে লেজুড় বেঁধে থেকো না। আমি তোমায় অনেকবার বলেছি, আবার বলছি।"

"তোমার সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি!" কান্তি যেন হেসে বলল।

"না, আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলবে না। আমার নিজের রাস্তা রয়েছে..."

কান্তি আস্তে করে পাশ ফিরে গেল। মিলির মুখ অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। চোখ খুলে শুয়ে আছে মিলি। নাকের ডগাটা কালো ভোমরার মতন দেখাচ্ছিল। কান্তি মিলির চুলের ওপর হাত রাখল। "তোমার একটা রাস্তা রয়েছে, আমার কিছু নেই।"

"তোমার বাবা আছে।"

"বাবা?"

"বরাবরই কি তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে থাকতে পারবে? বুড়ো আবার তোমায়..."

কান্তি আচমকা মিলির মাথার চুল মুঠো করে ধরল। যেন বলল, চুপ। মিলি চুপ করে গেল।

কান্তি বলল, "আমার বাবাকে কে বেশী চেনে? তুমি না আমি?"

মিলি কান্তির হাত মাথা থেকে সরিয়ে দিল। "তোমার বাবাকে তুমি চেনো গে যাও, আমার দরকার নেই। আমাকে তুমি চেনো না।"

"তুমি কী?"

"আমি জ্যোৎস্না নই।"

কান্তি মিলির নাক, মুখ, চুল, শাড়ি—সব কিছুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যেন বলল, "জানি। তুমি বিয়েফিয়ের ধার ধারো না, তেমন মেয়েছেলে তুমি নও।"

"হ্যাঁ তাই, আমি তাই। তুমি তোমার রাস্তায় চলে যাও, আমার সঙ্গে লেপটে থেকে তোমার লাভ হবে না।...এই নতুন নেশাটা তুমি ছেড়ে দাও।"

"কোন নেশা?"

"ওষুধ নেওয়া?"

"তুমিই শিখিয়েছ।"

"ছেড়ে দাও। এখনও চেষ্টা করলে ছাড়তে পারবে। পরে আর পারবে না। এর চেয়ে মদ খাও, মাতলামি করো—সেও ভাল, তবু এ নেশা ছেড়ে দাও।"

"তুমি নিজে কেন ছাড়ছ না?"

মিলি কোনো জবাব দিল না। তার বোধ হয় ঝিম ধরে আসছিল। চোখের পাতা বুজে ফেলেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধীর, গায়ের কাপড় বুকের তলায় গুটিয়ে রেখেছে। পাখা ঘোরার আওয়াজ কানে লাগছিল।

ঝিমটা যেন কেটে গেল। অলস গলায় আস্তে আস্তে মিলি বলল, "আমার কথা বলছ? আমার কথা আলাদা। আমি তোমাদের মতন ভদ্রলোকের মেয়ে বউ নই। আমার গায়ে আঁতুড় থেকেই নোংরা লেগে আছে। আমায় লোকে কত কি বলে, কত কি ভাবে। ঘেন্না করে, তামাশা করে...। আমার কত রকম কি আছে—তুমি তার কি জানো।" মিলি চুপ করে গেল।

কান্তি আর কথা বলল না। হাতটা বুকের কাছে টেনে নিল, টিনচার বেঞ্জিনের গন্ধ। গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে কান্তির মনে হল, সে বোধ হয় মিলির পাশে কোনো ঘা, কিংবা কোনো ক্ষত নিয়ে, কোনো ওষুধ মেখে শুয়ে আছে। মিলি এবং সে আজ কতদিন ধরে এইভাবে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছে? বছর খানেক কি? না, পুরো বছরও নয়, পাঁচ-ছ মাস হবে। এ ধরনের শোয়ার মধ্যে একটা দূর দূর ভাব আছে, পাশাপাশি অথচ অন্তরঙ্গ নয়। মিলি তার বাস্তবিক অন্তরঙ্গ নয়, তারা ঘনিষ্ঠ অথচ এই ঘনিষ্ঠতা তাদের কাউকে এখন পর্যন্ত বেঁধে ফেলে নি। মিলি তা চায় না, পছন্দ করে না। কান্তি নিজেও পছন্দ করে না।

মিলি ঘুমিয়ে পড়ছে যেন, অস্পষ্ট করে বলল, "তোমার হাতটা সরাও, নাকে

বড় গন্ধ লাগছে।"

কান্তি হাত সরিয়ে নিল। তারপর পাশ ফিরল আস্তে আস্তে।

ঘুম এসেও যেন মিলির চোখের পাতায় বসছিল না, সে ঘুমের মধ্যে ডুবতে পারছিল না। অথচ তন্দ্রা ঘন হয়ে এসেছে।

মিলির এখন যে কথাটা মনে আসছিল সেটা যেন তার বুকের এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। একটা সময় ছিল যখন এই জায়গা থেকে একটা খোঁচা উঠে এসে তাকে জ্বালাত। সেই ধারালো, বিশ্রী খোঁচাটা দিনে দিনে ভোঁতা হয়ে আসার পর এখন মিলি তা বড় একটা অনুভব করতে পারে না। কিংবা অনুভব করলেও তার ধার মিলির পুরু চামড়ায় বা শক্ত মনে যেন আর ফুটতে পারে না। মিলির এখন সেই পুরোনো, লুকনো কথাটা মনে পড়ল। তখন মিলি সবে ট্রেনিং শেষ করেছে, তারাপিসিও বেঁচে আছে। যেখানে চাকরি পেল মিলি সেখানে তার মাসখানেকও পুরো হয় নি, একদিন হঠাৎ সে মরমর। অসহ্য যন্ত্রণা, পিঠ কোমর পেট যেন পেকে গিয়েছে, কাপড় রাখাও যায় না, যন্ত্রণায় লুটোপুটি খাচ্ছিল, চেঁচাচ্ছিল, ঘামছিল গলগল করে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে মারা যায়। যন্ত্রণা তাকে অজ্ঞান করে ফেলছিল। মিলিকে নিজের হাসপাতালের বিছানাতেই শুয়ে পড়তে হল। হাসপাতালের বুড়ো ডাক্তার মনোমোহনবাবু পেথিডিন দিলেন। ধরা পড়ল, ব্যথাটা গল্ ব্লাডারের। কয়েকটা দিন পেথিডিন না নিয়ে উপায় ছিল না। মিলি সুস্থ হয়ে উঠল। মাস কয়েক পরে আবার। মনোমোহন ডাক্তার তখন নিজেই বিছানায় শুয়ে হার্টের রোগে, হাসপাতালের নতুন আসা ছোকরা ডাক্তার অনিল পাল আবার সেই পেথিডিনই দিল। দিন কয়েক নিতে হল মিলিকে। এরপর থেকে যেই ব্যথা উঠব উঠব করে, ঘিনঘিনে ব্যথা ছড়ায়—মিলি অনিল পালের কাছে ছুটত। ওর সঙ্গে মিলির একটা মাখামাখি চলছিল তখন। বেঁটে ফরসা চেহারা অনিলের, চোখ দুটো সব সময় ঝকঝক করত, মুখে মোলায়েম হাসি, কথাবার্তায় মধুর ফোঁটা পড়ত। অনিল পেথিডিনের নেশাটা তাকে ধরিয়ে দিল। শুধু কি পেথিডিনের নেশা ধরাল, সেই সঙ্গে আরও একটা নেশা। মিলির স্পষ্টই মনে আছে, অনিল এক একদিন মিলির সেই ছটফট অবস্থার মধ্যে কেমন করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, গায়ের ওপর টেনে নিত, জামা খুলে দিত, চুল খুলে দিত, শাড়িটাড়ি খসিয়ে দিত, আর কতরকম কিছুর লোভ দেখাতে দেখাতে মিলির শরীর থেকে সমস্ত তৃপ্তি শুষে নিত। মিলি তখন অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে, জীবনের অনেক কিছু বিশ্বাস করে বিছানার ওপর প্রায় উলঙ্গ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।...অনিল পাল মিলিকে কিছুদিন খুব লুটেপুটে নিয়ে পালালো। পালালো মানে তার চাকরি যেতে বসেছিল কি একটা অন্য কারণে। অনিল চাকরি ছেড়ে চলে গেল। মিলি অবশ্য ততদিনে বুঝতে পারছিল, তার সঙ্গে অনিল পালের সম্পর্ক কী! নাগালের মধ্যে ডাগর মেয়েছেলে পেলে পুরুষ মানুষের অনেকেই যা করে অনিল তাই করত।...যাক্ গে, সেই জানোয়ারটা চলে গেল, কিন্তু মিলি কিছু-

দিন মুষড়ে থাকতে থাকতে আবা। .।খন তার ব্যথাটা ঘিনঘিনে হয়ে উঠেছে। তখন আর অন্যের পরোয়া করল না মিলি, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিল। নেশার প্রলোভন মিলির অজানা ছিল না, সে জানত কোথায় গিয়ে ঠেকতে হবে। নেশাটাকে মিলি প্রাণপণে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত। কিন্তু আবার যেই ঘিনঘিনে ব্যথা দেখা দিত, ভয়ে ভাবনায় মিলি আবার সেই পেথিডিন নিত। নিজেই। এইভাবে তার নেশা পাকা হয়ে উঠছিল। নিজের ওপর ঘেন্না, বিরক্তি, রাগ ধরে গেলে মিলি ওই নেশার বাইরে বেরিয়ে এসে অন্য নেশা করেছে, সে তার পিসির মতন মদ খাবার চেষ্টা করেছে, নানা ধরনের বড়ি খেয়েছে। যতক্ষণ না ঘিনঘিনে ব্যথা জাগে মিলি ততক্ষণ অন্য কিছু দিয়ে এই নেশার ছটফটানি তাড়িয়েও রেখেছে, কিন্তু ব্যথা একটু এল কি মিলি সব ভুলে পাগলের মতন তার পুরোনো নেশায় ছুটল।...দূরে সরিয়ে সরিয়ে, মনকে শক্ত করে, অন্য কিছু অবলম্বন করে আমার দুর্বলচিত্ত হয়ে এযাবৎ কাটিয়ে আসছিল মিলি। তবে ইদানীং আবার তার সেই ঘিনঘিনে ব্যথা উঠতেই পুরোনো অভ্যেসটাকে যেন পাকা করে ধরে ফেলছিল। মিলি বোকা নয়, অজ্ঞ নয়। সে জানে এই সাংঘাতিক নেশা এমনি করেই মানুষকে খেয়ে ফেলে। মরফিয়ার নেশা, সে নিজে হাস-পাতালে দেখেছে। লোকটা ওই নেশার দোষেই একদিন পাগলের মতন হয়ে ছাদ থেকে লাফ মেরে মারা গেল। এমন খারাপ, পাজী, জঘন্য, কুচ্ছিত নেশা আর হয় না। খাল কেটে কুমীর আনার মতন এ-নেশা তোমায় তিল তিল করে শ্মশানের দিকে নিয়ে যাবে। সব বুঝে, জেনে, দেখতে পেয়েও মিলি আবার তার কাছেই ছুটে যায়-যত বিষ তাকে একদিন শেষ করে ফেলবে। এখনও মিলি যখন এসব কথা ভাবে আঁতকে ওঠে সে। তখন মন শক্ত করে ফেলে। না, আর সে নেবে না; সে মরবে মরুক, তার যদি মৃত্যু থাকে সে মরবে, তবু আর নেবে না। নেয় না মিলি, না নিয়ে অন্য ধরনের ওষুধ খায়। তারপর হঠাৎ যেই ব্যথা জাগল, না না না করেও শেষ মুহূর্তে যেন নিজের অজান্তেই মিলি কখন ওষুধটা তার শরীরে ঢুকিয়ে নিল। তারপর শান্ত, আরাম, সব অশান্তি দূর হল।...হাস-পাতালে রাত্রে ডিউটি থাকলে কী ভয় মিলির। সে সবসময় আতঙ্কে থাকে। শরীরের কোথাও একটু চিন্ করে উঠল, গা-গতর যেন আর বইতে চাইছে না মনে হল, অমনি ভয়ে ভয়ে শরীরকে ঝিমিয়ে দেবার একটা ওষুধ খেয়ে ফেলল। যেন তার পোষা সাপের ছোবলকে আটকাবার জন্যে মাটির সরাটা হাঁড়ির মাথায় ঢেকে দিল। তাতে সব সময় নিস্তার পাওয়া যায় না। সাপটা ভেতরে ভেতরে মুচড়ে উঠতে থাকে, ঢাকাটা সরিয়ে ফেলতে চায়, তার ছোবল চারপাশে একটু যেন জায়গার জন্যে ছটফট করতে থাকে। মিলি তখন কাজকর্ম ফেলে ছুটে নিজেদের ছোট ঘরটায় চলে যায়, দাঁতে দাঁতে চেপে থাকে, বসে দাঁড়ায়, নিজেকে নিজে গালাগাল দেয়, থরথর করে শরীর যেন কাঁপতে থাকে, চোখ পাগলের মতন ধকধক করে, জানলায় মাথা ঠোকে মিলি, পায়ে সেফটিপিন ফোটায়। কিন্তু ওই যে সর্বনেশে নেশা সেটা যেন মিলিকে টুঁটি চেপে ধরে। হাসপাতাল, চাকরি,

রোগী, দায়-দায়িত্ব, অন্যায়, আতঙ্ক সব ... যায় মিলি, বেহুঁশের মতন সে তাদের বাথরুমের দিকে চলে যায় হাতব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে নেয়। নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে আসে। ওয়ার্ড থেকে পদ্মজা বা সবিতা মাধুরী কাউকে ডেকে পাঠায়, বলে: 'আমার গল ব্লাডারের ব্যথাটা উঠেছে রে আমি এখানে থাকলাম। তোরা একটু দেখিস, ভাই।'...ধরা পড়তে পড়তে মিলি বেঁচে গেছে বার কয়েক। সে বোঝে, এই হাসপাতালে তার চাকরির আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে, তার নেশা ধরা পড়ে যাবে, তার চুরি ধরা পড়ে যাবে। তখন? .. তখন কি হবে এই ভেবেই মিলি আর দেরি করতে চায় না। সে এই বাঁধাবাঁধি, দায়িত্ব, থানা পুলিস, সকলের ঘৃণা ও ধিক্কার থেকে পালাতে চায়। পালিয়ে সে কোনো শহরে গিয়ে ঘর ভাড়া করে একটা নার্সদের ইউনিয়ন করবে। সেখানে মিলি স্বাধীন, নির্ভয়।

কিন্তু মিলি এই নেশা কান্তিকে কেন ধরাল? কেন?

মিলি ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কান্তির পিঠের দিকে হাত বাড়াল। স্পর্শ করল কান্তিকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ছয়

এ বর্ষা যেন যাবার নয়; চলছে তো চলছেই। কখনও প্রবল, একটানা, কখনও ঘিনঘিনে; হচ্ছে, যাচ্ছে, আবার হচ্ছে। শহরের বাড়ি ঘর রাস্তা বাজার, এমন কি মানুষজনও যেন আর্দ্র ম্লান হয়ে গেল। সারা শহরের আবর্জনা বাতাসকে দুর্গন্ধে ভরে তুলেছিল, রাস্তাঘাট কাদায় নোংরায় মাখামাখি। পদ্মঝিল জলে জলে নদী হয়ে গেছে, স্কুল ডাঙগার পথঘাটে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে আছে সপ্তাহ খানেক, গণিপাড়ার বস্তি থেকে অর্ধেক মানুষ উঠে এসেছে পুরোনো চারমাথার মোড়ে পরিত্যক্ত পুলিস ফাঁড়িতে। এরকম বৃষ্টি কয়েক বছরের মধ্যে আর দেখা যায় নি। আশে পাশে বান ডেকেছে। শহরের ছেলে ছোকরার দল একদিন চাল ডাল পুরোনো জামা কাপড় আদায় করতে বেরুলো লরি করে, সিংহীবাবুদের প্রাইমারী স্কুলে দাতব্য অন্নবস্ত্র বিতরণ হল, তারপর নিজেরাই পয়সাকড়ির ব্যাপার নিয়ে লাঠালাঠি করে দাতব্য কর্ম থেকে বিরত হল। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে একদিন তুমুল হয়ে গেল দিনেশ গ্রুপ আর সেন সিংহীবাবুদের প্রাইমারী স্কুলে দাতব্য অন্নবস্ত্র বিতরণ হল, তারপর নিজেরাই দল হারল না জিতল বোঝা গেল না, তবে দিনেশবা মিছিল বের করল মস্ত করে, তার চেলা গোপাল সাইকেলে করে মিছিলের আগে আগে ঘুরল।

কেমন একটা গা গড়াগড়ির ভাব নিয়ে অলস চোখে বর্ষা এই শহরের মাথায় শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন নিজের খেয়ালেই উঠে বসল। আঁচল গুটোতে লাগল। এবার যেন তার যাবার মতি হয়েছে। শেষ ভাদ্রে আচমকা আকাশের রঙ, মেঘের রঙ, রোদের রঙ পালটে গেল। অনেক দিনের স্যাঁতসেঁতানি, নোনা গন্ধ ফ্যাকাশে বর্ণ সহজে যাবার নয়, তবু সেই বিস্বাদ যেন কেটে আসছিল, আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

এমন এক দিনে কান্তির সঙ্গে শান্তিময়ের দেখা।

শান্তিময় পোস্ট অফিসের দিক থেকে ফিরছিল, কান্তি ছিল বাজারের চায়ের দোকান 'সুরমা কাফের' সামনে। চোখাচোখি হতেই শান্তিময় দাঁড়িয়ে পড়ল।

এগিয়ে গেল কান্তি। "আরে, তুই?"

শান্তিময় হাত বাড়িয়ে কান্তির একটা হাত ধরে ফেলল। "কি রে? কান্তি? কান্তি দি গ্রেট্! তোর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেল কি করে?"

কান্তি শান্তিময়ের অন্তরঙ্গতা তার হাতের উষ্ণ চাপের মধ্যে অনুভব করতে পারছিল। শান্তিময়ের অন্য হাতটা নিজের বাঁ হাতে তুলে নিয়ে কান্তি

ছেলেমানুষের মতন দোলাতে লাগল। খুব যেন খুশী হয়েছে। "তুই শালা বেঁচে আছিস?"

"আছি তো—" শান্তিময় হাসছিল।

"কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা রে। বছর তিন-চার?"

"অত নয়, তবে কাছাকাছি। কেমন আছিস তুই? তোর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"আমরা অনেক কিছুই খারাপ হয়ে গিয়েছে—" কান্তি কথাটাকে তখনকার মতন সরিয়ে দিয়ে বলল, "তোর খবর বল? তুই কবে এসেছিস? হঠাৎ এদিকে এলি কেন?"

"পরশু এসেছি।"

"পরশু? কোথায় উঠেছিস?"

"কোথায় আবার, বড়দার বাড়িতে।"

"বড়দা—মানে কানুদার ওখানে! কানুদাকে মাঝে মাঝে দেখি বটে রাস্তায়, কথাবার্তা হয় না। তোর খবরটবরও নেওয়া হয় কোথায়!"

"বড়দার কাছেই এসেছি। দরকারী একটা কাজ নিয়ে। কাল পরশু ফিরে যাব।"

"কোথায় আছিস তুই?"

"কেন, কলকাতাতেই।"

কান্তি শান্তিময়ের ছিপছিপে চেহারা, সেই বাদামী রঙের মুখ, হাস্যময় চোখ দেখতে দেখতে ক্রমশই প্রাণখোলা হয়ে উঠছিল। "চল্, একটু চায়ে বসি—" বলেই কান্তি শান্তিময়ের হাত ধরে এমন টানল যে শান্তিময় সামনের দিকে ঝুঁকে গেল।

শান্তিময় হাসল। 'চায়ে বসি' কথাটা শান্তিময়ের। কান্তি সেই পুরোনো কথা, পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিল।

শান্তিময় বলল, "চল্।"

কান্তি 'সুরমা কাফের' দিকে তাকাল। বলল, "সুরমায় যাব না; বড্ড ভিড়। যত শালা উঠতিরা বসে বসে খবরের কাগজ টেনে পলিটিকস আর খেলা মারাচ্ছে। অন্য জায়গায় চল। মিত্তিরদার দোকানে চল।"

"মিত্তিরদার দোকান আছে এখনও?"

"থাকবে না কি রকম। মিত্তিরদা ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলছে রে আজকাল। বাড়ি থেকে বউদি এসে দুপুর বেলায় ঘুঘনি রেঁধে দিয়ে যায়। ঝকুবেটা ওমলেট করে। ও দোকান তোর আমার লাইফে উঠবে না। আজকাল আবার দুপুরে তুই ভাতডাল মাছটাছ পাবি।" বলতে বলতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আচমকা কান্তি জিব আটকাল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কান্তি সিগারেটের প্যাকেট বের করে শান্তিময়কে দিল। "নে, ধরা।"

শান্তিময় সিগারেট নিল, কান্তিকে দিল; তারপর ধরিয়ে ফেলল।

কান্তি জিজ্ঞেস করল, "তুই কেন এসেছিস বললি না?"

চুপ করে থেকে শান্তিময় বলল, "চন্দ্রার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করেছি।"

কান্তি অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "চন্দ্রার বিয়ে?"

"একটা মোটামুটি ছেলে পেয়ে গেলাম। একটু একরোখা; কিন্তু ভালই বলা যায়, ছোটখাটো বিজনেস করে।"

কান্তি কেমন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল। চন্দ্রাকে সে চেনে, শান্তিময়ের বোন। এই বোনকে নিয়ে নানা অশান্তির পর শান্তিময় কানুদাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কানুদা কিংবা মানুদা শান্তির নিজের দাদা নয়, মাসতুতো ভাই; মা-বাবা মারা যাবার পর শান্তি আর চন্দ্রা মাসীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। মাসীমা যে চোখে ওদের টেনে নিয়েছিলেন পরে কানুদারা আর সে-চোখে দেখতে পারে নি। চন্দ্রার গলায় হাতে শ্বেতি বেরুবার পর আরও অশান্তি হতে লাগল। বোধ হয় চাপা একটা ক্ষোভ এবং দুঃখের জন্যে চন্দ্রার ফিটের রোগ ধরল। একেবারেই যখন অসহ্য হল তখন শান্তি তার বোনকে নিয়ে কানুদাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কলকাতায়।

কান্তি বলল, "কেমন আছে রে চন্দ্রা?"

"ভালই।"

"মোটাসোটা হয়েছে?"

"না, সেই রকমই। তবে দাগগুলো আরও ছড়িয়েছে। ওর কোনো ট্রিটমেন্ট করা গেল না।"

"তা ছেলেটা সব জেনেশুনেই..."

"হ্যাঁ। মুখটাও এখনও তেমন কিছু হয় নি এই বাঁচোয়া।"

"কবে বিয়ে?"

"শীঘ্র।"

"এখন বিয়ে হয়? আশ্বিন মাস না?"

"হওয়ালেই হয়।...তাছাড়া রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হবে।...দাদাদের কাছে একবার আসা উচিত বলে এসেছি। মাসীমা রয়েছে।"

"বেশ করেছিস। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।" কান্তি হাসল।

আরও একটু এগিয়ে মিত্তিরদার চায়ের দোকান। বাজারের প্রায় শেষ প্রান্তে। শান্তিময় খানিকটা অদল-বদল দেখল দোকানটার। আগে দোকানের ওপর দোতলাটা ছিল ভাঙা, অব্যবহার্য। এখন দেখল, কাঠের রেলিঙ দেওয়া দোতলার ফালি বারান্দা, মাথায় অ্যাসবেসটাসের ছাউনি। শান্তিময় বলল, "মিত্তিরদার দোকানের চেহারা পালটে গেছে যে রে।"

কান্তি বলল, "যাবে না! দোতলাটা এখন প্রভা হোটেল। বউদির নামে হোটেল।"

দোকানে ঢুকে ভিড়টিড় বেশী চোখে পড়ল না। ছোট জায়গা, খান কতক

টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রান্না ঘরের দিকে বঙ্কুরা কাজ করছিল। মিত্তিরদা বাজারে গেছে। এ সময় তাকে বাজার যেতে হয়। দুপুরে ডাল-ভাতের খদ্দের আছে ক'জন, তাদের জন্যে। নিজের জন্যও।

কান্তি শান্তিময়কে নিয়ে একেবারে কোনায় গিয়ে বসল। ওদিকে—দরজার পাশে—অন্য দু'জন চা খাওয়া শেষ করে কথা বলছে। একটা খবরের কাগজ চাপা দেওয়া।

কান্তি বঙ্কুকে ডাকল। "দু কাপ চা দে বঙ্কু, মেজাজ লাগিয়ে করবি, পুরোনো খদ্দের এসেছে, বদনাম করিস না।"

বঙ্কু মুখ বাড়িয়ে শান্তিময়কে দেখে নিল।

"আর কিছু খাবি, শান্তি? সকালে টোস্ট বিস্কিট পাওয়া যায়।"

"না, না; সকালে খেয়ে বেরিয়েছি।"

"একটা টোস্ট খা; তোকে শুধু শুধু চা খাওয়ালে প্রেস্টিজ থাকে না।" কান্তি হাসল।

"পরে খাব। এখন থাক।"

"কাল পরশু তো চলে যাবি? পরে তোকে কখন খাওয়াব?"

"কালই যাবার কথা। তবে দু' একদিন দেরি হয়ে যেতে পারে। মাসীমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার। দেখি কি হয়?"

দু-চারটে সহজ, সাধারণ কথাবার্তা হল। তারপর কান্তি শুধলো, "তুই কী চাকরি করছিস যেন?"

"স্কুলে পড়াই দিনের বেলায়, আর রাত্রে কলেজে একটা পার্ট টাইম করি।"

"তুই তা হলে মাস্টার।" কান্তি হাসল।

"হ্যাঁ; মাস্টার।" শান্তিময় সামান্য ঝুঁকে পড়ে কান্তির আরও ঘনিষ্ঠ হল। "তোর খবর বল।"

কান্তি হাসিমুখে শান্তিময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি আচমকা তাকে অন্যরকম করে দিল। বিষণ্ণ, ক্লান্ত, সতর্ক।

বঙ্কু চা নিয়ে এল। শান্তিময়কে চিনতে পেরেছে। হাসল।

শান্তিময় বলল, "কি রে, কেমন আছিস?"

বঙ্কু দু-চারটে কথা বলে কাজে চলে গেল।

কান্তি চা খাচ্ছিল, চা খেতে খেতে সে পা দোলাচ্ছিল; পা নড়ছিল। ছোট করে চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট বের করতে যাচ্ছিল কান্তি, শান্তিময় তার পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

কান্তির এইরকম চুপচাপ, অন্যমনস্ক, বিমর্ষ হয়ে যাবার কোনো কারণ বুঝতে না পেরে শান্তিময় বন্ধুকে লক্ষ করছিল। আবার বলল, "কি রে? খবরটবর বল তোর—।"

কান্তি সিগারেট ধরাবার জন্যে কাঠি জ্বালাল। "আমার কোনো খবর নেই।"

"কি করছিস?"

"কিছু না।-নাথিং।"

"একেবারে নিষ্কর্মা বসে আছিস?"

"বিলকুল..."

শান্তিময় ছেলেমানুষ নয়, কান্তির সঙ্গে তার যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল তাতে এই বন্ধুটিকে সে চেনে। সন্দেহের চোখে দেখতে দেখতে বলল, "তোর কী হয়েছে?"

কান্তি যেন বুকটা ভরে ফেলার জন্যে লম্বা করে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে গিলে ফেলল। দম বন্ধ করে থাকার মতন ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে রাখল। তারপর মুখ হাঁ করে শ্বাস ফেলল। বলল, "আমার অবস্থা খুব খারাপ।"

শান্তিময় একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। "কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার।"

কাপে মুখ ঠেকাতে ঠেকাতে শান্তিময় জিজ্ঞেস করল, "তোর বাড়ির খবর কি?"

কান্তি হঠাৎ হাত তুলে একটা উড়ন্ত মাছি ধরার জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "জানি না।"

শান্তিময় তেমন গা না করে সহজভাবে বলল, "জানিস না মানে?"

"জানি না মানে জানি না। তুই বদু, কিসের মাস্টার!"

শান্তিময় 'বদু' শব্দটা শুনে অট্টহাস্য হেসে উঠল। এই শব্দটা তারা তৈরি করেছিল অন্য একটা অশ্লীল শব্দের অপভ্রংশ হিসেবে। ভদ্রসমাজে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধে হত না। হাসি থামলে শান্তিময় বলল, "বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটি করেছিস নাকি?"

কান্তি এবার স্পষ্ট করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "বাড়িতে আমি থাকি না।"

শান্তিময় প্রথমটায় ঠাট্টা হিসেবে ধরতে গিয়ে কান্তির চোখ-মুখ দেখতে দেখতে কিসের যেন আশঙ্কা করল। কয়েক মুহূর্ত নজর করে মুখ দেখল কান্তির। বলল, "বাড়িতে থাকিস না তো কোথায় থাকিস?"

"সে জায়গা আছে।"

এক মুখ ধোঁয়া গলায় নিল শান্তিময়। "ব্যাপারটা কী?"

কান্তি চুপচাপ চা শেষ করল, চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে হাত ছড়িয়ে বসল দু' দণ্ড, দোকানের ফাঁকা টেবিল চেয়ার, জানলার ওপর আঁটা প্লাসটিকের ফুলঅলা পরদা, মিত্তিরদার শূন্য চেয়ার দেখতে দেখতে বলল, "ব্যাপার অনেক। এ লংগ হিস্ট্রি। খুনোখুনি ক্রিমিন্যাল ব্যাপারট্যাপার জড়িয়ে আছে।" বলতে বলতে কান্তি শান্তিময়ের দিকে আবার ঝুঁকে পড়ল। "তুই দু-একদিন এখানে থাকলেই সব শুনতে পাবি। হয়ত কানুদার কাছেই পাবি।"

শান্তিময় কৌতূহল এবং অস্বস্তি বোধ করছিল। "কি পাগলের মতন

বকছিস?"

"পাগলের মতন কিছু বলছি না।"

কেমন যেন বোকা হয়ে গেল শান্তিময়। "তুই সত্যি সত্যি বাড়িতে থাকিস না?"

"না।"

"তা হলে আছিস কোথায়?"

কান্তি হাত দিয়ে মিত্তিরদার দোকানের ওপরের দিকটা দেখাল। বলল, "দিনের বেলায় ওপরে দোতলায় থাকি; ওপরে মিত্তিরদার একটা ছোট একস্ট্রা ঘর আছে, বারান্দার দিকে। সেখানে থাকি। এখানেই খাই। আর রাত্রির দিকটা অন্য জায়গায়—।"

"যাঃ শালা, দিনে এক আর রাত্রে এক—!"

"হ্যাঁ; ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড।"

শান্তিময় আরও ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিল। কান্তির কথাবার্তা তার মাথায় ঢুকছে না। বাড়িতে থাকে না, দিনের বেলায় মিত্তিরদার চায়ের দোকানের দোতলায়, রাত্রে অন্য জায়গায়। শালা নিশ্চয় উন্মাদ হয়ে গেছে। অথচ শান্তিময় বেশ বুঝতে পারছিল—এই কান্তি আর পুরোনো কান্তি এক নয়, কিছু একটা হয়েছে, বড় রকমের। কী হয়েছে?

সিগারেটের টুকরোটা চায়ের কাপে ফেলে দিল কান্তি। বলল, "তুই তো কাল পর্যন্ত আছিস। পরশু পর্যন্তও থাকতে পারিস। কি রে?"

"হ্যাঁ, আছি।"

"আজ বিকেলে কোথাও আয় না। পারবি?"

"আজ বিকেলে। বিকেলে নাও পারতে পারি রে, মাসীমাকে নিয়ে বেরোবার কথা আছে।"

"তা হলে তুই এক কাজ কর; বিকেলে ছ'টা নাগাদ পারলে এখানে একবার ঢু মেরে যাস; আমি থাকতে পারি।"

মাথা হেলিয়ে সায় দিল শান্তিময়, "যদি ঝামেলা মিটে যায়, এখানে আসব!"

"বেশী দেরি করলে আমায় পাবি না।"

"পাব না কেন?"

"রাত্তিরে আমি এখানে থাকি না।"

"কোথায় থাকিস?"

কান্তি কিছু না বলে কেমন করে হাসল একটু। তারপর একেবারেই হালকা করে ঠাট্টার সুরে বলল, "শ্মশানে যাই।"

শান্তিময়ও ঠাট্টা করে বলল। "শব সাধনা করছিস নাকি?"

কান্তির চোখের তারা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার মন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কি মনে করে কান্তি বলল, "হ্যাঁ; শব সাধনা।"

ততক্ষণে মিত্তিরদা বাজারের মুটের মাথায় বাজার চাপিয়ে ফিরে এসেছে।

বন্ধুরা বেরিয়ে এল।

শান্তিময়কে দেখে মিত্তিরদা এগিয়ে এল। "আরে আরে শান্তিবাবু যে! তারপর কোথা থেকে? আমাদের একেবারে ভুলে গেলে? চা খেয়েছ? খবরটবর বলো।"

পরিচিত জনের মধ্যে যেমন কথাবার্তা কুশল বিনিময় হয় তেমনই আলাপ হল কিছুক্ষণ। শেষে শান্তিময় উঠে পড়তে পড়তে হেসে জিজ্ঞেস করল, "মিত্তিরদা কান্তি নাকি আপনার হোটেলে থাকছে আজকাল?"

"হ্যাঁ—একটা বেলা আমার সর্বনাশ করছে—"বলে আড় চোখে কান্তিকে দেখল। মুখের ভাবে যতই বিরক্তি দেখাক মিত্তিরদা, বোঝা গেল, মনে বোধ হয় কোনো আফসোস নেই।

কান্তি উঠে পড়ল। আড়চোখ মিত্তিরদাকে দেখতে দেখতে শান্তিময়কে বলল, "নে চল। হোটেল চালাবার এলেম কত! এটা বউদির হোটেল। প্রভা হোটেল।"

মিত্তিরদা বলল, "তোর বউদি বাপের বাড়ি থেকে হোটেলের টাকা কোঁচড়ে বেধে এনেছিল, হারামজাদা!"

শান্তিময় হেসে উঠল। কান্তিও হাসতে হাসতে শান্তিময়কে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে কান্তি বলল, "মিত্তিরদা মাইরি এখনও আমায় টানে। দি ওনলি ক্রীচার। এই শহরে আর কোনো বেটা আমায় জায়গা দিত না। দেবে না।"

"রাত্রে তোর জায়গা কোথায়?"

কী ভেবে কান্তি অন্যমনস্কভাবে বলল, "শুনলি তো শ্মশানে।"

আর বেশী এগোলো না কান্তি, শান্তিময়কে বিদায় দিল।

দুপুর বেলায় কান্তি অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছিল। বৃষ্টি কেটে যাবার পর এই রোদ এত প্রখর যে বাতাস তেতে উঠেছে। গরম লাগছিল, ঘাম হচ্ছে। অ্যাসবেসটাসের ছাদঅলা এই ঘরে দুপুরটা বেশ গায়ে লাগে। কান্তির এই ঘর ছোট। কাঠের দেওয়াল। ঘুলঘুলির মতন জানলা আছে দুটো বারান্দার দিকে। জানলা খোলা রাখলেও বাতাস বেশী আসে না। বারান্দার গায়ে কাঁঠাল গাছের ডালপালা বাতাস আড়াল করে রাখে। কাঁঠাল গাছটা পুরোনো, রাস্তায় দিব্যি নিজের জায়গা করে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে। কান্তি খালি গায়ে পাজামা পরে একটা ক্যাম্পখাটের ওপর শুয়ে ছিল। আসবাবপত্র বলতে এই ঘরে ওই ক্যাম্প খাট। একটা চেয়ার নীচে থেকে তুলে এনেছে কান্তি। কাঠের খুঁটির গায়ে দড়ি বেঁধে আলনা করেছে কান্তি। তার ওপর দু-চারটে জামাটামা ঝোলানো। আর একপাশে একটা সুটকেস। খোলাই পড়ে থাকে।

এক সময় দোতলাটা অব্যবহার্য ছিল। মাথার ওপর ছিল পুরোনো রঙ করা এবড়ো-খেবড়ো টিন। অর্ধেকটা ধসে গিয়েছিল প্রায়, বাকি অর্ধেকটায় মোহিত মাস্টার বসত সেলাই কল, কাঁচি, ছিটকাপড় নিয়ে। দরজিগিরি করত। মোহিত-মাস্টার মারা যাবার পর তার দোকান উঠে গেল। দোতলাটা পড়ে থাকল জঞ্জালের স্তূপ হয়ে। হঠাৎ মিত্তিরদার মাথায় বাই চাপল, দোতলায় হোটেল করবে। আজকাল শহর যেরকম বেড়ে উঠেছে তাতে হোটেলের ব্যবসা ভালই চলবে। মিত্তিরদার কোনোকালেই বেশী সংগতি ছিল না। বাড়িতে বউ আর এক আশ্রিতা ভাগ্নী। বউদি কাজের মানুষ। সন্তানাদি হয় নি। বউদির মাথায় বুদ্ধি ছিল, বলল—দোতলায় ঘর নেই, দোর নেই, কলঘর নেই; হোটেল করলে লোকে এসে থাকতে চাইবে কেন? তার চেয়ে শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রাখো। উৎপাত কমবে। তোমারও ভাগ্যে থাকলে দু' পয়সা হবে। সেই হিসেবে দোতলা ভাড়া নিয়ে নিজের পয়সায় আগাগোড়া সংস্কার হল। দোতলার একটা ভাগে খাওয়া-দাওয়া, আর অন্য দিকটায় এই ছোট ঘর মিত্তিরদা নিজের আরাম আয়াস ভাঁড়ারের জন্যে ফেলে রেখেছিল। কান্তি এসে সেখানে উঠল। তার উপায় ছিল না।

এই ঘরে থাকতে থাকতে কান্তির অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। কাঠের দেওয়ালে টিকটিকিগুলো ক'টা মরল, নতুন ক'টা এল তাও যেন সে বলতে পারে। এই ঘরে মিত্তিরদার হোটেলের কিছু কিছু মাল-মশলাও মজুত থাকে, চালের বস্তা, পেঁয়াজ, বনস্পতির টিন, সরষের তেল। কান্তি এই ঘরে আছে বলে মিত্তিরদা ঘরটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখতে চায়, পারে না। বলে, 'রাত্রে তো তুই থাকিস না, দিনের বেলায় আর এমন কি কষ্ট বল!...তা তুই যখন বাপের প্যালেসে থাকবি না তখন আর কি করা যাবে!'

বাপের প্যালেসে—মানে শচীন লাটের বাড়িতে—কান্তির ঘর অবশ্য খুব কায়দার ছিল। তার ঘর ছিল নীচের তলায়, পুব-দক্ষিণ খোলা রেখে, ঘরটা একেবারে চৌকো ছিল না, লম্বার দিকটা বড় ছিল, পুবের দিকের দেওয়াল অনেকটা তিন কোণা হয়ে দক্ষিণের দেওয়ালের সংগে জোড়া ছিল। বেশ বড় বড় ঘর, বিশাল বিশাল জানলা, বাহারী গ্রিল, শার্সি, কাঠের খড়খড়ি দেওয়া পাল্লা। মেঝেতে মোজাইক, দেওয়ালে রঙ, ঘরের সংগে বাথরুম। আসবাবপত্রের কোনো অভাব ছিল না; খাট, আলমারি, ওআল-র‍্যাক, টেবিল চেয়ার, ছোট মতন একটা ডিভান। বাড়ি তৈরীর সময়—যখন প্ল্যানট্যান হচ্ছে—তখন কান্তির ঘর দোতলায় হবারই কথা ছিল, নীচের তলায় একটা ছোট হলঘর আর বাবার মক্কেলদের জন্যে একটা ঘর হবার কথা হয়। বাবা নীচে বসেই কাজকর্ম করবে স্থির হয়েছিল। পরে কিছু ওলটপালট হয়ে গেল, নীচে কান্তির ঘর হল, মক্কেলদের বসার এবং বাবার অফিস মতন একটা ঘরও থাকল নীচে; ভেতরের দিকে রান্নাবান্না, ভাঁড়ার এই সব; ঠাকুর-চাকরদের আস্তানা হল তারও পেছনে। দোতলায় বাবা এবং রানী থাকে। বাবা আর রানীর পাশাপাশি কান্তির থাকা

শোভা পায় না। বাবাও চায় নি, তার ঘরের কাছাকাছি ছেলে থাকুক। কান্তিও চায় নি। মা বেঁচে থাকার সময় বাড়ির নকশাটকশা কথাবার্তা যখন চলছিল তখনই একবার কান্তিকে দোতলায় তোলার কথা হয়েছিল; কিন্তু তাতে অসুবিধে বলে কান্তিকে নীচেই রাখা হল।

মার খুব বাড়ি বাড়ি রব ছিল। কালীতলার পুরোনো বাড়িটা যে ছোট কিংবা খারাপ ছিল তা নয়, তবে শহরের মাঝমধ্যিখানে সেকেলে বাড়ি মার ভাল লাগত না। পাড়াটাও ছিল পুরোনো, ঠাসা। মহুয়াবাগানের জমি বিলির মুখেই বাবা জমি কিনে ফেলল। মা তখন থেকেই বাড়ি বাড়ি করে অস্থির। বাবা খুব ঝকঝকে একটা বাড়ি করবে, আয়াস-আরাম সেখানে ঠাসা থাকবে মা এটা চাইত। মার চরিত্রই ছিল এই ধরনের, সাধারণ গোছের। মা চাইত বাবা টাকা রোজগার করুক, বড়লোক হোক, বাড়ি করুক, জমিজমা করুক। আসলে মার বরাবরই এই বাসনা ছিল, তার স্বামী শচীন মজুমদার, অর্থে এবং সামর্থ্যে এই শহরের আরও দু-পাঁচজন ডাক্তার, উকিল, রেলের অফিসার, এনজিনিয়ার, ব্যবসাদারদের সংগে পাল্লা দিয়ে দেখাক মজুমদার-উকিল কিছু কমতি নয়। টাকার ওপর মার ঝোঁক ছিল, টাকাতেই প্রতিপত্তি, খ্যাতি, সম্ভ্রম। এবং আভিজাত্য দেখাবার জন্যে এর বেশী কিছু থাকতে পারে না। মা তুলনা করে করে মেপে মেপে স্বামীর খাতির যাচাই করত। বাস্তবিকপক্ষে, বাবা কত আয় করছে, মার জন্যে বছরে কত ভরি সোনা আসছে, পুরোনো থেকে নতুন, নতুন থেকে আরও নতুন গাড়ি বাবা কি কিনছে মার মন সেদিকে পড়ে থাকত। বাবার চরিত্রের অন্য দিক মার দেখার দরকার ছিল না, তার প্রয়োজনও মনে করত না মা।

বাবার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, চাতুর্য, ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের কাছে মার অস্তিত্ব ছিল মামুলি। মা বাবাকে বরাবরই অহঙ্কার ও আত্ম-তৃপ্তির চোখে দেখে এসেছে। বাবার বিরুদ্ধে মার কোনো অভিযোগ ছিল না। মদ্যপানে বাবার অভ্যাস মা খুব স্বাভাবিকভাবে নিত, যে-মানুষটার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা আইনের চিন্তা, যার আহার বিশ্রামের সময় নেই, যাকে অনবরত মক্কেলদের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সহ্য করতে হচ্ছে, মোটা মোটা আইনের বই ঘাঁটতে হচ্ছে তার পক্ষে মদ্যপান যে বিশেষ প্রয়োজনীয় মা এটা ধরে নিয়েছিল। কাজেই শচীন মজুমদার জীবনে কোথাও অভিযোগ শোনে নি, বাধা পায় নি।

ভগবানের এমনই মার, যে-বাড়ির জন্য মার অত আগ্রহ, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা, সে-বাড়ি শেষ হবার আগেই মা মারা গেল। স্থূলতার ভারে মার শরীরে কেমন একটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ জুটেছিল। মাঝে মাঝে সেটা বেড়ে যেত। একেবারে অকর্মণ্য শয্যাশায়ী করে ফেলত। ওই থেকে হোক কিংবা অন্যান্য কারণে মার নানারকম ব্যাধির উপসর্গ বাড়তেই লাগল; ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেল, মাথার যন্ত্রণা লেগে থাকত, বুকের কষ্ট। এই সময় মা রানীকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। রানী সম্পর্কে মার এক ধরনের বোন, মাসীর তরফের কিছু একটা। রানী শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া কোথায় যেন থাকত। খানিকটা লেখাপড়া শেখা

মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিল কি হয় নি বোঝা মুশকিল। মা বলত, হয়েছিল—বিয়ের পরের দিন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে রানীর বর ডুবে যায়, আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। রানী নিজে সে কথা বলে না; বলে : বিয়েতে বসার আগেই কিসের গোলমাল বেধে যাওয়ায় বরপক্ষ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কান্তি যা শুনেছে সবই মার মুখে; যেন বলতে হয় বলেই মা বলেছিল কখনো-সখনো।

মা রানীকে প্রথমে একবার এনে মাস দুই কাছে রেখেছিল তারপর ফেরত পাঠায়। মাস চার-পাঁচ কাটতে না কাটতেই আবার রানীর উদয় হল, মা তখন বেশ অসুস্থ; বোধহয় মজুমদারই আনিয়েছিল রানীকে। রানীকে শচীন মজুমদারের পছন্দ হয়েছিল। মারা যাবার আগে আগে বোধহয় মার এসব ভাল লাগে নি। কিন্তু বিবাহিত জীবনে যে মেয়ে স্বামীর ব্যক্তিত্বের কাছে একেবারেই ডুবে ছিল—তার পক্ষে তখন আর কিছু বলার ছিল না।

কান্তির বেশ মনে আছে একদিন সন্ধ্যেব দিকে কান্তি মার কাছে গিয়ে দেখল মা চুপিচুপি কাঁদছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে। একলা প্রায়-অন্ধকার ঘরে মা নিজের মনে কাঁদছিল। কান্তি কিছুই বুঝতে পারে নি।

বিছানার কাছে গিয়ে এই কান্না লক্ষ করে কান্তি কেমন বোকার মতন বলল, 'কি, তোমার আবার বুক ব্যথা করছে নাকি?'

মা চুপচাপ, কোনো জবাব দিচ্ছিল না। শেষে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'হ্যাঁ—ব্যথা।'

'খু-ব! ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না।'

ঠিক কি করবে বুঝতে না পেরে কান্তি বলল, 'ও-কে ডেকে দি।' ও মানে রানী।

মাথা নেড়ে মা বলল, 'না না'। তারপর একটু থেমে কান্তির দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কাউকে ডাকতে হবে না। নিজের বাড়িতে বাইরের কাউকে ডাকতে নেই......কখনো ডাকতে নেই'।

কান্তি তখন কথাটা স্পষ্ট বোঝে নি। পরে বুঝেছিল।

মা মারা যাবার আগে মহুয়া বাগানের বাড়ির বারো আনা কাজ হয়ে গিয়েছিল। কথা হয়েছিল, মার যা শরীরের অবস্থা তাতে গৃহপ্রবেশ করে তারা নতুন বাড়িতে চলে আসবে। দিন-ক্ষণ দেখাও শেষ। কিন্তু মার শরীর এতই খারাপ হয়ে পড়ল যে টানা-হেঁচড়া না করে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত হল। নতুন বাড়িতে পা দেবার জন্যে মা ছটফট করছিল। পা দেবার আগেই মারা গেল। বাবা বাড়ির গেটে মার নাম শ্বেতপাথরে লিখে বাঁধিয়ে মাস পাঁচেক পরে গৃহ-প্রবেশ করল।

শালা ভগবানের কী মজার খেলা। যে-বাড়ি ছিল মার সাধ, স্বপ্ন, যার নকশা কাগজে কলমে যতটুকু তার হাজার গুণ ছিল মার মাথায়, কল্পনায়; যে-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট মা মনে মনে গুনত, দেওয়ালগুলো আঁচল দিয়ে মুছত, যার

মেঝেতে মা সারাদিন কল্পনায় পা ফেলে হেঁটে বেড়াত, যার বাগানে মা আগে থেকেই দু-চারটে ফুলের গাছ পুঁতে এসেছিল—সেই মা বেচারী ম্যাজিকের খেলার মতন 'ভ্যানিশ' হয়ে গেল। মার দেহটাও ও বাড়িতে পৌঁছল না। তার বদলে ওই প্রাসাদে পা দিল রানী, শালা উত্তরপাড়া না শ্রীরামপুর থেকে আসা একটা মাগী।

কপাল ঠোকো আর যাই করো, শচীন লাটের প্রাসাদে রানীই রানীর হালে বসল। ফিক্সড্ পজিশন; শচীন লাট হাত ধরে বসিয়ে দিল। কার সাধ্য তাকে হঠায়।

কান্তি গোড়াগুড়ি থেকেই রানীকে পছন্দ করে নি। প্রথম যখন এল, মা বেঁচে রয়েছে, মা নিজেই আনিয়েছিল, তখন রানীকে দেখে কান্তির মনে হয়েছিল, তাদের পরিবারে থাকার যোগ্যতা ওর নেই। বাড়িতে বাবা এবং মা সহবত-টহবত খুব মানত। রানীর তা ছিল না। বাবা যে কোনোদিন ওকে তাড়িয়ে দিতে পারে বলেও কান্তির সন্দেহ হত। কান্তির সঙ্গে তখন জমাবার চেষ্টা করেছিল রানী।

কালীতলার পুরোনো বাড়িতে থাকার সময় রানী প্রথম আসে। ওই বাড়ির ব্যবস্থা একটু সেকেলে ছিল। নীচের তলাটা ছিল পুরোপুরি বাবার। বসার ঘর আর মক্কেলদের ঘর, কাজ-কর্ম করার জায়গা। দোতলায় শোওয়া বসা। তেতলার একদিকে থাকত কান্তি, অন্যদিকে একেবারে খোলামেলা ঢালাও ছাদ। একদিন শীতকালে রানী সবে এসেছে তখন, মাস খানেকও পুরো হয় নি, ভোরের দিকে দরজায় কড়া নাড়া শুনে ঘুম ভেঙে উঠে কান্তি দরজা খুলে দিল। মাঘ মাস। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কুয়াশা জমে আছে চাপ হয়ে। দরজা খুলেই কান্তি দেখল রানী। না, কোনো দরকারে নয়, সকাল হয়ে গেছে বলে রানী জাগিয়ে দিতে এসেছে। কান্তি ফিরে গিয়ে সটান আবার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক কতক্ষণ খেয়াল নেই হঠাৎ গায়ে ধাক্কা খেয়ে কান্তি আবার চোখ খুলল।

রানী বলল, 'এখনও ঘুমোচ্ছ! তোমায় উঠিয়ে দিয়ে গেলাম না।'

'বড্ড শীত', কান্তি বলল, 'রোদ উঠুক, তারপর উঠব।'

'এই বয়েসে আবার অত শীত কি!...ওঠো!...তোমার বিছানাটা কী গরম গো বাবা, খুব আরামে শোও, না?' বলতে বলতে লেপ এক পাশে সরিয়ে রানী বিছানায় বসে পড়ল। বিছানায়, লেপে হাত বোলাতে বোলাতে হেসে বলল, 'আমারই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে আবার।' পা তুলে রানী যেন শুতে যাচ্ছিল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কান্তি কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে শুয়ে থাকল। রানী লেপের তলায় হাতটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দেবার আগেই সে উঠে বসল।

হাসতে হাসতে রানী বলল, 'তোমার চা এনেছি। মুখ ধোবে, না, না-ধুয়েই খাবে?'

'খাচ্ছি।' কান্তি বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

রানী আরও পাঁচ রকমভাবে কান্তির সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করেছিল। 'তুমি আমায় মাসী বলো না কেন? ভাল লাগে না বলতে? দিদিকে আমি বলেছি-- তোমার ছেলে আমায় মাসী বলতে চায় না। তুমি না হয় বাপু দিদি বলো। তোমার চেয়ে বয়েসে আমি চার বছরের বড়।'

একদিন রানী রাত্রিবেলায় এসে বলল, 'বুকে ফোড়া উঠলে কি দেয় গো জানো? আমি তো মরে যাচ্ছি।' বলে রানী তার জামার বোতাম খুলে ফোড়াটা দেখায় আর কি! আর একদিন সিঁড়ির মধ্যে রাস্তা আটকে বলল, 'আমার গা না ছুঁয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে? পারলে তোমায় আমি খাওয়াব।'

রানীর এই ধরনের ব্যবহার কিন্তু শেষের দিকে হুট করে পালটে গেল। তারপর সে চলে গেল। আবার এল মাস চার-পাঁচ পরে। চেহারাটা এখানে থাকতেই মুটিয়ে ফেলেছিল রানী। এই ক'মাসে তার ইতরবিশেষ হয় নি তেমন। আবার যখন এল, রানীর হাবভাব সামান্য অন্য রকম। দেখতে দেখতে তার চালচলন পালটে যেতে লাগল। কে বলবে, সে এ বাড়ির আশ্রিতা? কান্তির সঙ্গে আর মাখামাখি করতে আসত না। বরং কান্তিকে তফাতে রেখে খুব সতর্ক হিংসুক চোখে দেখতে লাগল। রানী বোকা নয়, নির্বোধ নয়। এখানে থাকতে থাকতেই শেষের দিকে সে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল, শচীন মজুমদার তাকে পছন্দ করছে। যখন সে আবার চলে গেল তখন কেউ জানুক না জানুক সে নিশ্চয় উত্তরপাড়ায় থাকতে থাকতে জানতে পেরেছিল, আবার সে আসবে। এখান থেকে তার নামে টাকা-পয়সা যেত এটা বোধহয় মাও জানতে পেরেছিল। ফিরে এসে রানী যে তার জামাইবাবুকে খুবই খুশী করল এতে আর অবাক হবার কি আছে। কান্তিকে তার প্রয়োজন না থাকলেও ভয় ছিল। মা বেঁচে। রানীর সাধ্য ছিল না কান্তির সঙ্গে সরাসরি খেয়োখেয়ি শুরু করে।...বেচারী মা, শচীন মজুমদারের ধর্মপত্নী, বছর তিরিশ যে মানুষটি স্বামীর সংসার আগলে রেখেছিল, স্বামীকে নিয়ে অহঙ্কারে আত্ম-তৃপ্তিতে পরম সুখী ছিল—সেই মানুষটি বিছানায় শুয়ে শুয়ে একে একে সব হারাতে লাগল। বোঝাই যেত, বাবা রানীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু শচীন মজুমদার ভদ্রলোক, সে লেখাপড়া জানা, আইন জানা মানুষ, তার প্রখর বুদ্ধি, মাপা চাল; প্রকাশ্যে বাবা কোনোদিনই এমন কিছু করত না যে বোঝা যাবে রানী প্রশ্রয় পাচ্ছে। ঠিক উলটো ভাবটা দেখাত বাবা: কোর্ট থেকে ফিরে প্রথমেই মার ঘরে গিয়ে বসত, শরীরের খোঁজ-খবর করত, দু-চারটে এদিক-ওদিকের খবর দিত, নতুন বাড়ির কথা বলত। বাবা মাকে সব সময় বোঝাতে চাইত, সংসারে মা অনেকদিন একহাতে সব সামলেছে; এবার মার আরাম, আয়েস দরকার, সুস্থ থাকা দরকার। ঘর-সংসার, খাওয়া পরা, ঝি-চাকর, কার কি সুবিধে অসুবিধে— এ-সব গার্হস্থ্য ব্যাপারে মাথা গলাবার দরকার তার নেই। রানী দেখুক। তাকে তো অকারণ আনা হয় নি। মা কিছু বুঝুক আর না বুঝুক—মার আঁচলে বাঁধা তিরিশ বছরের কত কিছুর চাবি কখন খসে গেল, কিংবা চুরি হয়ে গেল। রানী

সে-চাবি মুঠোয় নিল।

মা মারা যাবার পর রানীর আর গ্রাহ্য করার কিছু থাকল না। নতুন বাড়িতে সে সর্বময়ী। তার কথায়, মর্জিতে, হুকুমে সংসার চলে। দোতলায় বাবার শোবার ঘরের কাছাকাছি তার ঘর, সে না হলে কে বাবাকে দেখাশোনা করবে?

কান্তির সঙ্গে রানীর তখন শত্রুতার সম্পর্ক একেবারে শেষ সীমায়। কান্তি এই হারামজাদী মাগীটাকে সহ্য করতে পারছিল না, রানী কান্তিকে নয়। কেউ কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলত না, কেউ কাউকে মানত না, পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করত, নিষ্ঠুর চোখে দেখত। একই বাড়ির মধ্যে দুটো বিষাক্ত সাপ যেন যে যার নিজের মধ্যে ফুলত, হিস হিস করত, আর বিষ জমাত। শচীন মজুমদার কি বুঝেছিল কে জানে, নির্বিকার নীরব থাকত।

এই সময় বাবার শরীর খারাপ হল। যা হয়, ব্লাড প্রেসার, প্রস্ট্রেট, আরও পাঁচটা উপসর্গ। ডাক্তার-টাক্তার কত রকম এল, এমন কি বাবা একবার কলকাতা থেকেও ঘুরে এল রানীকে সঙ্গে নিয়ে। এরপর বাবার শরীর-স্বাস্থ্য, মন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধে-অসুবিধে, আরাম সব কিছু দেখার দায়িত্ব হল রানীর একার। হ্যাঁ, আগেও রানীর এই দায়িত্ব ছিল, তবু অসুস্থ মানুষকে দেখার দায় তো আরও বেশী।

কান্তি দোতলায় যাওয়া আগেই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে আর যেতই না। বাবার সঙ্গে তার কথাবার্তা বন্ধ। এমন কি শচীন মজুমদার ছেলের মুখ বড় একটা দেখতে পেত না, কান্তিও কদাচিৎ দেখত। নিজের মরজিতে থাকত কান্তি, নীচের তলায়, খেত, ঘুমোতো, গাড়ি বের করে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে যেত, টাকা-পয়সার দরকার হলে নন্দকে ওপরে পাঠিয়ে দিত বাবার কাছে। শচীন মজুমদারের হিসেবে তার জামাটামা আসত, মনিহারি জিনিস আসত, যা চাইত সবই। এ নিয়ে রানী দু-একবার কথা বলতে এসে বুঝে গিয়েছিল, কান্তিকে ঘাঁটাতে গেলে হয়ত সে খুন হয়ে যাবে। রনী আর আসে নি। কিন্তু তার আক্রোশ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

অসহ্য লাগছিল কান্তির। রানীকে মাঝে মাঝে তার খুন করতে ইচ্ছে হত। শচীন মজুমদারকে সে অনেক আগে থেকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। ওই লোকটা, মানে তার বাবা, সমাজে ন্যায়-অন্যায়ের হয়ে লড়বার জন্যে কালো কোরতা গায়ে চাপিয়েছে। লোকটা ধর্ম, ন্যায় এবং সত্যের জন্যে লড়তে এসেছে. অথচ দেখো, ওর কাছে যত খুনে, গুন্ডা, বদমাশ, শয়তানের ভিড়। যে খুনী তাকে শচীন মজুমদার প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে নিরপরাধ, যে শয়তান তাকে সে একেবারে সাধু সজ্জন প্রমাণ করে ছাড়ছে। তাজ্জব ব্যাপার! সত্যি তাজ্জব। তুমি শালা আইন করেছ; বলছ, এখানে অন্যায়ের বিচার হবে, দণ্ড হবে; তুমি 'বদু' সংসারে ন্যায় দেখাতে জাস্টিস জাস্টিস করে চেঁচাচ্ছ, অথচ তোমার তলা শচীন মজুমদাররা ফুটো করে দিচ্ছে। মজাটা মন্দ নয়। মানে, শচীন মজুমদার মার্কা ঘুঘু লোকরা যদি টাকা পায় তাহলে সাদাকে কালো কালোকে সাদা করে

সংসারে চালিয়ে দিতে পারে, তখন আর বলার কিছু থাকে না। ধরো কলেজের শিরীষ কুণ্ডুর কথা। শিরীষ কুণ্ডু মেয়ে কেসে হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল। কলেজ থেকে তাকে সাসপেণ্ড করে রাখা হয়। বাবা লোকটার হয়ে লড়ল, প্রমাণ করে দিল শিরীষ কুণ্ডু নিরপরাধ। তার ফলে, লোকটা কলেজের চাকরি ফেরত চাইল। কলেজের সাধ্য হল না. আদালত যাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে তার চাকরি খায়। বসে বসে মাইনে খেতে লাগল লোকটা। শেষে হাতে পায়ে ধরে রেজিগনেশান নিতে হল শিরীষ কুণ্ডুর কাছ থেকে। সে শালা বগল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তাহলে, কান্তি ভেবে দেখেছে, জাস্টিস-ফাস্টিস কিছু নয়, দু-পাঁচজন একেবারে হতভাগ্য, না হয় একেবারে ফুটো কাপ্তেন হলে ন্যায় বিচারের জালে ধরা পড়ে, অন্যরা সেরা সেরা উকিল ধরে আইনের মার-প্যাঁচ দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করে স্যাট স্যাট বেরিয়ে আসে। বাবার এই কেরামতি আছে বলেই বাবা শচীন উকিল। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পশার জমিয়েছে। আর বাবার এই ওকালতির জীবনে—পিতৃদেব কত যে খচ্চর, বদমাশ, গুণ্ডা, খুনে, ক্রিমিন্যালদের আইনের ফাঁক থেকে বাঁচিয়ে সমাজে দিব্যি হেসে খেলে স্ফূর্তি করে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। এই পিতা নাকি স্বর্গ, ধর্ম, পরমং তপঃ—হ্যাত্, শালা—কে স্বর্গ কে ধর্ম! অল ফল্‌স্..। যারা বাবাকে স্বর্গ মনে করে—অন্তত বৈতরণী—সেই লোহাবাজেরা শচীনবাবুকে খাতির করে, বাবুর জন্যে কেউ পুজোর সময়. কেউ দেওয়ালিতে মস্ত মস্ত ভেট পাঠায়। থানা পুলিসের সঙ্গেও বাবার বরাবর খাতির। পাঠক-দারোগা তো বাবার মালটানার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

বাবা যখন যৌবনে টাকা ও যশের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্রিমিনাল কেসে হাত পাকিয়ে ফেলছে, তখন যদি মা বাবাকে একটা 'চেক্' দিতে পারত—হয়ত কিছু হত। মা তা দেয় নি। মা ছিল একেবারে সাধারণ সংসারী মেয়ে, টাকার লোভ, সম্পদের লোভ, বাড়ি-ঘরের লোভ এবং বিরাট মূর্খতা মাকে কিছুই করতে দেয় নি। মার জন্যে বাস্তবিক কান্তির কোনো দুঃখ নেই। কি হবে দুঃখ করে? তুমি তোমার স্বামীকে যেমনভাবে দেখতে চেয়েছিলে তোমার স্বামী তার বারো আনা সাধ মিটিয়ে দিয়েছে। যা চাও নি, মানে রানীর সঙ্গে তোমার স্বামীর সম্পর্ক, সেটাও তোমার বোকামো, খাল কেটে ওই কুমীর তুমিই প্রথম এনেছিলে। আসলে, স্বামীর কাছ থেকে তুমি এত পাচ্ছিলে যে তোমায় কিছু কিছু ছাড়তে হচ্ছিল স্বামীর জন্যে। অনুগত, অনুরক্তা স্ত্রীর মতন তুমি সে-সব ছেড়ে দিচ্ছিলে। শেষে তোমার খেয়াল হল. সর্বনাশ একটা ঘটেছে; তখন আর করার কিছু ছিল না।

বাবার সম্পর্কেও কান্তির বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, সম্ভ্রম নেই, দুর্বলতাও নয়। থাকবার কোনো কারণও নেই। বরং অসম্ভব ঘৃণা, তিক্ততা, ক্রোধ এবং অবজ্ঞা রয়েছে। গ্লানি বোধ করে কান্তি, শচীন মজুমদারের কীর্তি এ শহরের মানুষের অজানা নয়, তারা অনেক নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে, নাক কুঁচকোয়,

থু থু করে, আবার চাঁদার জন্যে, খাতিরের জন্যে বড় বড় ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট করে রাখে। এই শালারাই বলে, শচীন লাট বুড়ো বয়েসে মেয়েছেলে পুষেছে, ওই মেয়েছেলেটাই এখন কলকাঠি নাড়ে। শচীনের মেয়েছেলেটাই সব লুটে নেবে, শচীন উকিল মরার আগে এমন প্যাঁচ করে যাবে যাতে কান্তির আর করার কিছু থাকবে না, পথে বসতে হবে।

কান্তি এসব গ্রাহ্য করতে চায় নি। ভবিষ্যৎ নিয়ে অত মাথা ঘামাতেও তার ইচ্ছে হত না। কিন্তু একদিন, সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কী যে হল, কেন হল, কী হয়েছিল কান্তির—কিছুই আর ভাল করে মনে পড়ে না; দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেন ঘটনাটা ঘটে গেল, কিংবা বেহুঁশ জ্বরের মধ্যেই কিছু ঘটে গিয়েছিল। প্রচণ্ড নেশার মধ্যে নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্বই যেমন থাকে না, কান্তিরও তখন নিজের মধ্যে কিছু ছিল না। সে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছিল। কার কাছে? ক্রোধ এবং হিংসার কাছে, নাকি কোনো অজ্ঞাত আদিম ঘৃণা ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তির কাছে সে জানে না, কান্তি বীভৎস, ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলল।

ভীষণ ঘেমে যাচ্ছিল কান্তি; গলগল করে। হাত দুটো আড়াআড়িভাবে কপালের ওপর। চোখে আড়াল পড়ায় আলো আসছিল না। গুমোট, ঘাম, সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি যেন তাকে আচমকা সচেতন করে তুলল। তাড়াতাড়ি কপালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল কান্তি। ঘরে আলো আবছা হয়ে আসছে। বিকেল হয়ে গেছে কখন। বঙ্কু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ধপধপ শব্দ করতে করতে উঠে আসছে।

কান্তি ক্যাম্প খাটের ওপর তাড়াতাড়ি উঠে বসল। সমস্ত গা জল হয়ে গিয়েছে।

বঙ্কু ঘরে এল। হোটেলের কিছু মাল-মশলা নিতে এসেছে।

ক্লান্ত গলায় কান্তি বলল, "আমায় এক গ্লাস জল খাওয়া তো।"

ঘরে কুঁজো ছিল, কাচের গ্লাস ছিল। জল দিল বঙ্কু।

জল খেয়ে কান্তি নিঃশ্বাস ফেলল। সামান্য বসে থেকে উঠে পড়ে সিগারেট ধরাল; তারপর তোয়ালে নিয়ে গা মুছতে মুছতে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

সরু বারান্দা, কাঠের রেলিং, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। কান্তি বারান্দায় কুঁজো হয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাজারের রাস্তাঘাট বিকেলের দিকে গম গম করতে শুরু করেছে। বাস যাচ্ছে, রিকশা, ট্যাক্সি। রেলের অফিসবাবুরা কেউ কেউ ফিরছে। অপেরা সিনেমার ভ্যান মাইকে গান বাজিয়ে হ্যান্ডবিল ছড়াতে ছড়াতে চলে যাচ্ছে।

এখন পাঁচটা বাজে। আকাশ খটখটে। রোদ সরে গিয়ে প্রায় যায় যায় করছে। শান্তিময় ছ'টার সময় আসবে কি না কান্তি বুঝতে পারল না। এলে শান্তিকে নিয়ে ঝিলের দিকে বেড়াতে যাওয়া যেত।

মিলি এখানে নেই। বর্ধমান গিয়েছে। আজ ফেরার কথা। যদি ফিরে এসে

থাকে তবে দুপুরেই ফিরেছে। না হয় সন্ধ্যের মধ্যেই আসবে। বাড়ির চাবি কান্তির কাছে। কান্তি মিলির বাড়ির পাহারাদার হয়ে আছে। মিলি না থাকায়, মিলির বাড়িতে একা একা থাকতে ভাল লাগে না কান্তির। হুইস্কির বোতলটা শেষ হয়ে গিয়েছে। মিলিই দিয়ে গিয়েছিল কিনে, নিজে একটু এঁটো করে দিয়ে বলেছিল, চুরি চামারি করবে না, আমি দেরাজ ফেরাজে চাবি দিয়ে দিয়েছি, ওই খেয়ে শুয়ে থাকবে।

মিলি আজ না ফিরলে কান্তির বেশ কষ্ট হবে।

সাত

পদ্মজার বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে বৃষ্টি এসে গেল। মিলি তখনও রাস্তায় নামে নি; পথে থাকলে ভিজে যেত। আশ্বিনের খেপা বৃষ্টি, কোথায় লুকিয়েছিল কে জানে, এই শেষ বিকেলে আচমকা এল, এক পশলা জল ছড়িয়ে আবার পালাল। রাস্তায় নেমে আকাশের দিকে তাকাতেই মিলি দেখল, গাঢ় ধোঁয়া বর্ণের পাতলা একটা মেঘের টুকরো নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তার মনে হল, ওই মেঘটাই যেতে যেতে বৃষ্টি দিয়ে গেল।

কিছুদিন ধরে পদ্মজা বলছিল, সে এখন একটা অ্যাংলো বাড়িতে একপাশে চমৎকার একটা ঘর পেয়েছে, খাওয়া-দাওয়া থাকা—সবই এক জায়গায়; তার বাস্তবিক কোনো খরচাই নেই, তবে অ্যাংলো বুড়ীর বড় মেয়ে পাগল গোছের, তাকে একটু দেখাশোনা করতে হবে। হাসপাতালের ডিউটি ফুরোলে পদ্মজার আর কাজ কি, সে তো বাড়িতেই থাকে—না হয় একটা মাঝবয়সী মেয়ে পাগলকে দেখবে। প্রায় বিনি খরচে থাকতে পারলে কে আর সে সুযোগ ছাড়তে চায়। পদ্মজা ছাড়ে নি। মিলিদের অনেকবার করে বলেছে—এসো, আমার নতুন ডেরা দেখে যেয়ো।

মিলি এসেছিল বেড়াতে; পদ্মজার সঙ্গে আড়ালে দুটো কথাও বলতে। নিজের কথা। বেরুবার মুখে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামলে পথে নেমে মিলি দেখল, পদ্মজা তার বাড়ির কাঠের ছোট ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে।

পদ্মজা ভাল জায়গাতেই এসেছে। ছোট, পুরোনো বাংলো বাড়ি; অল্প বাগান; একপাশে হাত পা এলিয়ে থাকার মতন ঘরও পেয়েছে। হাসপাতালটা এখান থেকে তেমন বেশী দূরেও নয়। পদ্মজা হেঁটেও যেতে পারে।

মিলিদের পাড়া কিংবা বাজার থেকে অবশ্য অনেক দূর। তাতে আর কার কি ক্ষতি!

বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আবহাওয়াটা চমৎকার হয়ে উঠেছিল। ধোয়া মোছা, পরিষ্কার। আকাশের অনেকখানি এখনও নীল নীল দেখাচ্ছে, ছড়ানো তুলোর মতন এক টুকরো সাদা মেঘ একদিকে ভেসে যাচ্ছে, অন্য দিকে সেই বৃষ্টি দেওয়া মেঘটা পালিয়ে যাচ্ছে। রোদ নেই। কেমন এক সোনালী আভা ধরে আছে চারপাশে।

মিলি বাড়িটাড়ির কথা না ভেবেই হাঁটছিল। ভাল লাগছিল। হাসপাতাল, বাড়ি আর বাজার ঘাট—এছাড়া তার বেরুনো হয় না। ভালও লাগে না। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতে চলে যায়, তাও যদি হাসপাতালের মেয়েদের কারও সঙ্গে

কথা থাকে।

এদিকে তেমন ভিড় ভাড়াক্কা নেই। সাইকেলে করে লোকজন যাচ্ছে, একটা মোটর বাইক চলল. রাস্তার কলের জল বন্ধ হয়ে গিয়েছে. দুটো সালোয়ার-কামিজ পরা পাঞ্জাবী মেয়ে খুব হাসাহাসি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। ডেয়ারীর সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে একদিকে।

মিলি কেমন আলস্যমির ভঙ্গিতে হাঁটছিল। তার কোনো তাড়া নেই. কাজকর্ম নেই। চারপাশের সোনালী রঙ আরও যেন নরম হয়ে এল। বৃষ্টি ধোওয়া বিকেলের শেষে সন্ধ্যের মুখে-মুখে এমন একটা রঙ মিলি অনেক দেখেছে। ডিমের কুসুমের মতন রঙ অনেকটা। এ হল গোধূলি। ছেলেবেলায় বাঁকুড়ায় থাকতে মিলিরা এই সময় বর্ষার দিনে ঘড়িং ধরত। চোরকাঁটা ভরা মাঠে ঘাসের ওপর দিয়ে তারা কত ছুটত, লাফাত, চেঁচাত, গান গাইত মজা করে।

বড় রাস্তায় উঠে মিলি একটু দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবছিল, কি করবে, হেঁটে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে, না রিকশা নেবে। এখানে টপ করে খালি রিকশা পাওয়া যায় না। দাঁড়াতে হবে একটু।

রেল পুলের দিক থেকে একটা পুরোনো গাড়ি বিদিকিচ্ছিরি শব্দ করতে করতে আসছিল। গাড়িটা আসছে মিলি দেখেছিল। দেখার মতনই গাড়ি। গাড়িটা মিলির কাছাকাছি এসে আচমকা থেমে গেল। থামতেই মিলি কান্তিকে দেখতে পেল। কান্তির সঙ্গে আর-একজন, মিস্ত্রী-টিস্ত্রীর মতন।

কান্তি গাড়ি থেকে নেমে আসতে আসতে পাশের লোকটাকে কিছু যেন বলছিল। বলে সে নেমে এল। গাড়িটাও আবার শহরের দিকে চলে গেল।

কাছে এসে কান্তি বলল, "তুমি এখানে?"

মিলি বলল, "পদ্মজার বাড়িতে এসেছিলাম।"

"প-দ্ম-জা!...ও, তোমার হাসপাতালের ফ্রেন্ড।"

"ওই গাড়িতে করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"এই কাছাকাছি। ট্রায়াল দিচ্ছিলাম। ত্রিদিবের গ্যারেজে কাজ হচ্ছে। মিস্ত্রী একটু দেখতে বলল। তাই..."

"দেখা হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ, এখনও পুরো কাজ হয় নি; আরও রয়েছে। মিস্ত্রীকে বললাম, আজ নিয়ে গিয়ে রেখে দাও—কাল দেখা যাবে।"

মিলি কোনো কথা বলল না। আশপাশে তাকিয়ে কোথাও একটা রিকশা তার চোখে পড়ছিল না।

"বাড়ি ফিরবে?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"তো আর কোথায়?"

কান্তি এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বলল, "চলো একটু ঘুরে যাই।"

মিলি প্রথমে কিছু বলল না, তারপর বলল, "কোথায় যাবে ঘুরতে?"

"চলো, হাঁটতে থাকো—বেড়ানো মানে বেড়ানো।......চলো, ঝিলের দিকেই যাই।"

ঝিল খুব কাছে নয়, এখান থেকে কতটা দূর মিলি তাও জানে না। এই শহরে তার বেশী ঘোরাঘুরি নেই, মোটামুটি পথ-ঘাট চেনে। কান্তি এমনভাবে ঝিলের কথা বলল, মনে হল—এমন কিছু দূর জায়গা নয়। কান্তি পা বাড়াল দেখে মিলিও হাঁটতে লাগল, ঝিলের দিকেই যাবে এমন কোনো কথা নেই। আসলে মিলির আজকের এই আবহাওয়া মনে ধরে গিয়েছিল। ভালই লাগছিল বেড়াতে।

কান্তি পাশে পাশে চলতে লাগল। বড় রাস্তা ধরে। এ-পাশ ফাঁকা। পাশে উঁচু নীচু মাঠ, কোথাও কোথাও কাঁটা ঝোপ, বালিয়াড়ির মতন মাটির স্তূপ এক এক জায়গায়, বিস্তর মাটি কেটেছে—কেন কে জানে, জল জমেছে গর্তে, ভিজে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, রাস্তার পাশের গাছ গাছালি সদ্য বৃষ্টির জল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কান্তি বলল, "চলো, শর্ট কাট করে যাই।" বলে মিলিকে মাঠে নামতে ইশারা করল।

কান্তির সঙ্গে বাইরে ঘুরে বেড়ানো হয় না মিলির। সে পছন্দ করে না। কান্তিও গা দেখায় না। মিলি মোটেই চায় না, এই শহরের মানুষজন দেখুক সে কান্তির মতন একটা ছেলেকে ট্যাঁকে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকের মতিগতি অভ্যেস মিলি ভালই জানে; এ ধরনের ঘোরাঘুরি করলেই মজাটা ওদের আরও বাড়বে, তামাশা জমাবার আরও সুযোগ হবে, তাকে নিয়ে রসিকতা ইতরতা বেড়ে যাবে। এমনিতেই তার পাড়ার লোকেরা, হাসপাতালের মেয়েরা আরও অনেকেই জানে মিলি কান্তিকে নিয়ে থাকে। পুরুষ মানুষ নিয়ে থাকার দুর্নাম বা বদনাম তার রয়েছে। রাস্তা-ঘাটে ফোড়ন আওয়াজ, শিসটিস তার কানে এসেছে। মিলির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে লোকে ইঙ্গিত না করে তাও নয়। মিলি গ্রাহ্য করে না। কান্তির সঙ্গে সে আছে—এটা তার খুশির ব্যাপার, অন্যের নয়। সে তো কারও বাঁধা মেয়ে বউ নয়। মিলি যেমন গোপনতাও চায় না, তেমনি আবার হাটে-বাজারে কান্তিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও তার আপত্তি। কান্তিরও হয়ত তাই। সে কোনোদিনই মিলিকে নিয়ে বাজারে পথে-ঘাটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় নি। দু-একদিন শুধু তারা দুজনে রিকশা চেপে স্টেশনের দিকে গিয়েছে। নয়ত, জোড় বেঁধে তারা ঘোরে না।

কান্তির পাশে পাশে হাঁটবার সময় মিলির এই ধরনের কথা মনে আসছিল। আজ অবশ্য মিলি বিরক্ত বা অখুশী হচ্ছিল না। ভালই লাগছিল। জায়গাটাও ফাঁকা, মানুষজন তেমন নজরে পড়ছে না। সেই কুসুমের আভাটা এখনও রয়েছে। পাখিরা ফিরে যাচ্ছে দল বেঁধে।

সিগারেট ধরিয়ে নিল কান্তি। "ওই খোয়ার রাস্তাটায় উঠতে হবে। মিনিট দশ পনেরো হাঁটলেই ঝিল।"

মিলি ভিজে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ঝিলের জল কমে গেছে?"

"কবে! খুব বর্ষার সময় জলে চারদিক ডুবে গিয়েছিল," কান্তি বলল, "এখন একেবারে ঠিক।"

"তুমি বুঝি এদিকে আস?"

"মাঝে সাঝে।......আমার এক বন্ধু এসেছিল—শান্তি, তার সঙ্গে হালে একদিন এসেছি, রাস্তা-ঘাট ঠিক আছে। শান্তির কথা তোমায় বলেছি না?"

মিলি মাথা হেলাল, হ্যাঁ—সে শুনেছে।

খোয়ার রাস্তায় উঠল মিলি। রিকশা যাচ্ছে ঝাঁকুনি খেতে খেতে। কেউ বোধ হয় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরছে।

কান্তি বলল, "স্কুলের দিদিমণি।"

মিলি রিকশার দিকে তাকাল। দুটি মেয়ে।

কান্তি বলল, "কালো মতন বেঁটেটাকে আমি চিনি, বিশ্বাসপাড়ায় থাকে।"

"কি নাম?"

"প্রতিমা-টতিমা হবে। দিদিমণিদের নাম ওই রকম হয়—!" কান্তি হাসল।

রিকশাটা কাছ দিয়ে যাবার সময় রিকশার দু'জনেই চেয়ে চেয়ে কান্তিদের দেখছিল।

মিলি বলল, "তোমায় বেশ চেনে।"

"আমায়! আমায় কে না চেনে! তুমি মাইরি আমার বেইজ্জতি করছ। এক সময় আমি শহরের হিরো ছিলাম। এখন পড়ে গিয়েছি......" কান্তি ঠাট্টা করে বলল।

"কোথায়?" মিলি আড়চোখে তাকাল।

"গর্তে, ডোবায়, কাদায়।"

গোধূলির সেই আভা আকাশের তলা দিয়ে এবার উঠে যাচ্ছিল। দ্রুত। ঝাপসা হয়ে আসছে।

মিলি বলল, "ঝিলে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

"যাক্। চাঁদ উঠবে।"

"আজ কি?"

"জানি না। তবে চাঁদ ওঠে।"

মিলি কথা না বলে হাঁটতে লাগল। শনশন করে বাতাস এল দমকা; গায়ে মুখে ঝাপটা দিচ্ছে, মিলির পায়ের দিকের শাড়ি উড়ছিল পতপত করে। আঁচলটা সামলে নিল মিলি।

ঝিলের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যেই হয়ে এল। এখনও আকাশের কিছু কিছু নজরে পড়ে। একেবারে নির্জন নয় ঝিল। দু-পাঁচজনকে দেখা যায়। বেড়াতে এসেছিল, ফিরব ফিরব করছে। জলের দিকটা কালচে হয়ে গিয়েছে; ঝিলের পেছন ধরে ঝোপঝাড়। এ পাশের রাস্তাগুলো এক সময় বাঁধানো ছিল,

এখন এবড়ো-খেবড়ো। সাইকেল নিয়ে জনা তিনেক ছেলে আড়ালে কোথায় বসেছিল, উঠে গেল। সাধু গাছের একজন ঝিলের কাছে বসে আপন মনে গান গাইছে, ভক্তিটক্তির গান। একটা মারোয়াড়ী বউ একটু আগে তার বাড়ির রিকশায় ফিরে গেল।

ঝিলের কাছাকাছি একটা বাঁধানো গোল চাতাল, মাথার ওপর গম্বুজ করা ছাদ। চাতালের তলায় সিঁড়ি দু-তিন ধাপ। ঝিলের একপাশে কবে যেন এক নার্শারী ছিল—এখনও তার অবশিষ্ট রয়েছে। কাঁটার বেড়া দেখা যাচ্ছিল।

মিলি বলল, "এখানে সাপখোপ আছে।"

কান্তি হেসে বলল, "অনেক সাপ।"

"অন্ধকারে এখন কোথায় বেড়াব? সাপখোপে কামড়াবে?"

"বসো না। ওই চাতালে বসো।"

মিলি চাতালে বসল। এটা তবু নিরাপদ। বর্ষার শেষে এই সব জল গাছ-পালা ঝোপঝাড় ঘাসে বেড়াতে তার সাহস হচ্ছিল না। ফিরবেই বা কি করে! এদিকে রিকশা এমনিতে পাওয়া যায় না, কেউ বেড়াতে এলে সেই ফাঁকা ফিরতি রিকশা ধরে ফিরে যাওয়া যায়। হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

খানিকটা আগে মিলির মন যতটা ভাল লাগার মতন হয়েছিল, এখন আর তা হল না। বরং বিরক্তিই লাগছিল। কান্তির কথায় সায় দিয়ে ঝিলের দিকে আসা তার উচিত হয় নি।

কান্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এই ঝিলটা আগে মার্ভেলাস ছিল। আমরা হরদম বেড়াতে আসতাম। একটা নৌকো ছিল, ছোট নৌকা, দাঁড় টানতাম।"

মিলি অনেকটা হেঁটে আসার ক্লান্তি দূর করছিল, কথা বলল না।

ঝিলের দিকে তাকিয়ে থাকল কান্তি। চুপচাপ। তারপর আবার বলল, "ভাল জায়গা-টায়গা এরা আর থাকতে দেবে না। ঝিলটার বারোটা বাজিয়ে দিল। আগে গরমকালে বিকেলে এখানে মেলা বসে যেত, এত ভিড় হত লোকের। এখন কোথায়? কেউ আসতে চায় না।"

মিলি দেখল, ঝিলের দিকে থোকা থোকা জোনাকি উড়ছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে কে যেন আঁচল ঝেড়ে ঝিলের জলে আলোর টুকরো ফেলে দিচ্ছে। ঝোপগুলো কালো হয়ে গেল; মাথার ওপর আকাশটায় তারা ফুটেছে। ঝিলের কোথাও আর মানুষের গলা পাচ্ছিল না মিলি। সব চলে গেছে।

কান্তি বসল। মিলির পাশে। পা দুটোকে সিঁড়ির ধাপে ছড়িয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বের করল, "একটু পরে চাঁদ উঠে যাবে।"

"চাঁদ?" চাঁদের খবর মিলি বড় রাখে না। এ ক'দিন একেবারেই পারে নি। হাসপাতালে রাত ডিউটি ছিল। পরশু একটা কেস্ খারাপ হয়ে গেল। অ্যাক্লেমেসিয়া। বড় ভুগিয়েছে।

কান্তি সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় মুখ দেখা গেল কান্তির। দাড়ি কামানো হয় নি; মুখ কালচে হয়ে রয়েছে।

"আমার সিগারেট খাবে একটা?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"তুমি খাও।"

"তোমার এই জায়গাটা ভাল লাগছে না?"

ভাল লাগার মতন মিলি কিছু পাচ্ছিল না। এমন অন্ধকার আর নির্জনত তাকে কেমন অস্বস্তিতে ফেলেছে। "আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।"

'কেন, সবে তো সন্ধ্যে।"

"বাঃ, কতটা ফিরতে হবে।"

"সে ভার আমার। তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ। ঘাবড়াচ্ছ কেন?"

"আমি অত হাঁটতে পারি না।"

"হেঁটো না; আমি ঘাড়ে করে নিয়ে যাব।" কান্তি হাসল।

মিলি কথা বলল না। কান্তি সঙ্গে রয়েছে এটা অবশ্য ভরসার কথা।

গা এলিয়ে বসে সিগারেট খেতে খেতে কী ভেবে কান্তি হঠাৎ বলল, "আজ সকাল থেকে মজার মজার কান্ড হয়ে যাচ্ছে।...প্রথমে দেখলাম পরেশ ঘোষে মেয়েকে, আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল।" পরিহাস করেই বলছ কান্তি; বলে ঘাড় তুলে মিলির মুখ দেখবার চেষ্টা করল, যেন দেখতে চাইছিল- মিলি কথাটা বিশ্বাস করে কি না করে। 'মা তখন বেঁচে; পরেশগিন্নী মাবে খুব জপিয়েছিল। বাবা তখন আমায় ল' পড়ার জন্যে কলকাতা পাঠাবার কথ ভাবছে। আমার শালা তখন মার্কেট ভ্যালু কত—, শচীন মজুমদারের একমাত্র বংশধর, বি এ পাস করেছি, ল' পড়তে যাব। পরেশের মেয়ে আমায় একজোড় রুমাল তৈরী করে সেন্ট ঢেলে প্রেজেন্ট করেছিল। মাইরি বলছি, দিয়েছিল তা মেয়েটাকে আমরা বলতাম, জপমালা। ওর বাবা মা দুজনেই ঠিক ঠিক জায়গায় যা জপাতে পারত, না দেখলে তুমি বুঝতেই পারবে না। বেটা পরেশ ঘোষ রবারের কারখানা খুলে ফেলল জপিয়ে জপিয়ে।"

মিলির বোধ হয় মজা লাগছিল; বলল, "বিয়েটা করে ফেললেই পারতে।"

"ফেললেই হত।...তখন অত মাথায় ঢোকে নি। আমার মাথায় ঘিলু কম তখন বলতাম,...রবারের মেয়েকে কে বিয়ে করবে! ওকে দেখলেই মনে হবে রবার-প্রোডাক্ট।" কান্তি হাসল। "বিয়েফিয়ে নিয়ে তখন কে মাথা ঘামায়। বাব তখন ছেলেকে নিজের লাইনে সাইডিং করবার চেষ্টা করছে। মাইরি, একবার ল'-টা পাস করে এলে দেখতে। বাবার মার্কেট আমার বাঁধা হয়ে যেত। কী ফিউচার!...আজ শালা দুঃখু হচ্ছে, অমন ভবিষ্যৎ একেবারে হেলায় হারালাম।.. বুঝলে মিলি, রামপ্রসাদ যা বলেছে একেবারে পাক্কা কথা; আবাদ করলে ফলতো সোনা।" কান্তি হাসতে লাগল। "আমাদের লাইফে লাঙলই পড়ল না।"

মিলি বলল, "মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবার পর কি হল?"

"কিচ্ছু না। বাজারে গাড়ি আটকে গিয়েছিল। মুটে মজুরের মতন খানিকটা ঠেলে দিলাম। জপমালা চলে গেল।"

"তোমায় চিনতে পারল না?"

"কেন পারবে না? চোখে চোখে চিনে একটু ইয়ে করল—মনে পড়ছে পড়ছে গোছের করল। বাপের বাড়িতে এসেছে পরেশের মেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। পুজোর বাজার করতে এসেছিল। বিশাল চেহারা করে ফেলেছে। চোখে গগলস্।"

"কী বলল?"

"কিচ্ছু না। বাচ্চা আর জিনিসপত্র সামলাতে খুব ব্যস্ত তখন...।"

মিলি ঝিলের দিকে তাকাল। অন্ধকারের ইতরবিশেষ হয় নি, আগের মতনই। জল, মাটি, ঘাস, গাছপালার গন্ধ ভারী হয়ে রয়েছে।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছিল কান্তি। একদিকের কনুইয়ে ভর রেখে আরও একটু এলিয়ে বসল, তার মাথা মিলির হাঁটুর কাছাকাছি। খানিকটা সময় চুপচাপ। কান্তি আবার বলল, "দুপুরে মাইরি আর-এক কাণ্ড। আমি ত্রিদিবের গ্যারেজে ছিলাম; শ্রীপতি ওই গাড়িটা - যেটা দেখলে—তার কাজ করছিল, আমিও ঠুকঠাক করছিলাম, হঠাৎ শালা গ্যারেজের কাছে বাবার গাড়ির হর্ন। শুনে চমকে উঠেছিলাম। একটু সাইড্ মেরে দেখলাম, গাড়িতে রানী বসে আছে। সামনে ড্রাইভার যুগল আর রানীর পেয়ারের চাকর মহাদেব। আমি ব্যাক্ দিয়ে স্ট্রেট ত্রিদিবের অফিস ঘরে। ত্রিদিব বেটা বাইরে গেল। ফিরে এসে বলল, গাড়ির কি একটা খুলে গেছে সারিয়ে নিতে এসেছে যুগল। গাড়ি কল্যাণেশ্বরী যাচ্ছে।...জানলা থেকে দেখা যায় না, বাইরে এসে উঁকি মেরে দেখলাম, রানী ডাঁটিয়ে বসে আছে, গরদ তসর কিসব যেন বলে তাই পরে।" কান্তি হাসির গলায় শ্লেষের সুরে বলছিল কথাগুলো, চাপা এক বিদ্বেষ এবং ঘৃণাও রয়েছে বলার ভঙ্গিতে। "রানী পুজো দিতে যাচ্ছে, বুঝলে মাইরি। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে আসবে। আমার বাবার আবার ঠাকুর দেবতায় খুব ভক্তি, মা কালীর ছবি মাথার কাছে টাঙিয়ে রাখে। আজকাল গীতা ভাগবত শুনছে রোজ। ধার্মিক লোক। ভীষণ ধার্মিক..." বলতে বলতে কান্তি খেপার মতন হেসে উঠল।

মিলি কোনো কথা বলল না। রানীকে সে দেখে নি, শচীন মজুমদারকে দেখেছে, আগে, যখন শচীন মজুমদারকে বাইরে দেখা যেত - তখন। কে যেন দেখিয়ে দিয়েছিল।

বসে থাকতে থাকতে আর যেন কিছুই করার নেই বলার নেই দেখে আবার সিগারেট ধরালো কান্তি। তারপর হঠাৎ হাত তুলে আকাশের দিকটা দেখাল। "ওই দেখো চাঁদ।"

আকাশের কোথায় যে চাঁদ উঠেছে মিলি প্রথমে দেখতে পায় নি, এবার দেখল। খুব ফিকে চাঁদ, রঙ ধরে নি ভাল করে। হয়ত আগেই উঠেছে, চোখে পড়ে নি। মেঘের আড়ালেও থাকতে পারে।

কান্তি বলল, গলার সুর বেশ হালকা। "সকালে জপমালা, দুপুরে রানী, বিকেলে মিলুবালা! আজ শালা আমায় দারুণ দিন।"

মিলি কিছু অনুমান করছিল। কান্তিকে এক এক সময় কেমন যেন লাগে মিলির, মনে হয়, মানুষটার সমস্ত কিছু খেলা, কোথাও কোনো টান নেই, মায়া নেই, আগ্রহ নেই, না দুর্বল, না নিষ্ঠুর; মিলির সঙ্গে তার সম্পর্কও ওপর ওপর, পাতলা।

মিলি বলল, "আমার কথা বাদ দাও—"

কান্তি মিলির হাঁটু টেনে কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কথা বলল না। দুজনেই চুপচাপ। ঝিলের ওপর ফিকে চাঁদ ধীরে ধীরে ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে আসছিল। জোনাকি জ্বলছে অজস্র। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা।

কী খেয়াল হল মিলির, কান্তির মাথার কাছে হাত রাখল আলগা করে. বলল, "তুমি একদিন বাড়িতে যাও।"

"বাড়ি! কেন?"

"যাও না; এমনি ঘুরে এস।"

"তোমার শালা মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

মিলি রাগ করল না। বলল, "গেলে কী হবে?"

কান্তি প্রথমে কোনো জবাব দিল না। খানিক পরে বলল, "না, বাড়িফাড়ি যাওয়া হবে না।"

মিলি কান্তির আঙুল থেকে সিগারেটটা টেনে নিল। তারপর আচমকা বলল, "আমি এখান থেকে চলে যাবার পর তুমি কি করবে?"

কান্তি ওপর দিকে তাকাল, মিলির চোখমুখ সে দেখতে পাচ্ছে, ততটা স্পষ্ট করে অবশ্য নয়। "তুমি সত্যি সত্যিই চলে যাবে?"

"যাব না! বারে...তোমায় কী বলেছি।"

"আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"করো না বিশ্বাস। দেখতেই পাবে।"

কান্তি চুপ করে থাকল।

মিলি এবার সামান্য চাঁদের আলো দেখতে পাচ্ছিল, ঝিলের গায়ে ঝোপের মাথায় পাতলা জ্যোৎস্না পড়েছে। এমন নির্জন, স্তব্ধ, শূন্য জায়গায় বসে থাকতে থাকতে তার যেন আর ভাল লাগছিল না।

কান্তি বলল, "তুমি এখানেই একটা নার্সেস ইউনিয়ন খোল না। আমি তোমার বাড়ি খুঁজে দেব।"

"এখানে?...না, এখানে নয়।"

"কেন?"

"এখানে চলবে না।...অসুবিধে হবে।"

"বর্ধমানে চলবে?"

"চলতে পারে, না চললে কলকাতায় চলে যাব।"

"কলকাতায় তোমার কে আছে?"

"কেউ না। জানাশোনা একজন আছে, পার্বতীদি। আগের হাসপাতালে

কাজ করেছি একসঙ্গে। একটা নার্সিং হোমে ইনচার্জ হয়ে আছে পার্বতীদি। বিয়ে করেছে। আমায় লিখেছে কলকাতায় গেলে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।"

"তোমার অনেক টাকা, মাইরি," কান্তি মজার গলায় বলল, "নার্সেস ইউনিয়ন খুলবে।"

"অনেক।...নাও, ওঠো। আর বসে থাকতে পারছি না।"

কান্তি উঠল না। মিলির হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে থাকল। চোখ বুজে থাকল খানিকক্ষণ, তারপর চোখ খুলে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, "এখন যা লাগছে। দারুণ। একেবারে শালা সাবিত্রী-সত্যবান।...তুমি সাবিত্রী সত্যবান জান?"

"না।"

"কী মুখ্যু মাইরি তুমি! খেস্টান হলে সাবিত্রী সত্যবান জানতে নেই—!"

"আমি খেস্টান নই।"

"তুমি কী?"

"কিছু না। এমনি একটা মেয়েছেলে।"

"কার?"

"তোমার।"

কান্তি ঝপ করে উঠে বসল। বসেই মিলির গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি মাইরি মেয়েছেলেও নও। মেয়েছেলে তোমার মতন হয় না। রানী হল মেয়েছেলে। তুমি যে কী, কে জানে।"

মিলি উঠে দাঁড়াল। বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে, কান্তির মাথার চাপেও হতে পারে। দাঁড়িয়ে থেবে পায়ের ঝিনঝিন ভাবটা কাটিয়ে নিল।

হাই তুলল কান্তি, "চলো।"

হাঁটতে শুরু করে মিলি বলল, "অ-নেক হাঁটতে হবে।"

"খানিকটা। বড় রাস্তায় রিকশা পেয়ে যাব।"

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুজনে।

কান্তি বলল, "আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। সাংঘাতিক। রাক্ষস রাক্ষস লাগছে।"

"আমার তেষ্টা পাচ্ছে খুব।"

"চলো, তোমার পানের দোকানে জল খাওয়াব।"

জ্যোৎস্না ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছিল। রাস্তা একেবারেই ফাঁকা, গাড়ি মানুষ আলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে রেল লাইন দিয়ে একটা গাড়ি হুইসল বাজাতে বাজাতে চলে গেল, শব্দটা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে আসছিল।

মিলি বলল, "এরকম ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় আমার ভয় করে।"

"কেন?"

"কি জানি!"

"ভূতের ভয়?" কান্তি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল।

"না, ভূতের ভয় আমার নেই।"

কান্তি হাঁটতে হাঁটতে বলল, "শুনেছি যারা পাপটাপ করে তারা ফাঁকাটাকায় থাকতে চায় না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সিনারস্ আর অ্যাফ্রেড্ অফ লোনলিনেস। তুমি আবার খেস্টান। পাপীতাপী।"

"তুমি তাহলে কী?"

"আমি। আরে শালা, আমি তো ঘোর পাপী।...নিজের বাপকে খুন করতে গিয়েছিলাম।"

"তোমার ভয় করে না?"

কান্তি সাড়া দিল না প্রথমে, পরে বলল, "করে। আমারও করে। ভীষণ ভয় করে মাঝে মাঝে, গলায় ফাঁসির দড়ি লটকে যাবার মতন মনে হয়।"

রাস্তাটা ভাল নয়, এবড়ো খেবড়ো; পাথর বেরিয়ে আছে, কাদা জমেছে কোথাও কোথাও, মাঝে মাঝে জমা জল। পাশে পাশে ঘাস গজিয়েছে। দুদিকে মাঠ। অনেকটা উত্তরে আকাশ কেমন লাল হয়ে আছে, লোহা কারখানার দিকে। বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছিল, আলো ফেলে ফেলে গাড়ি যাচ্ছে, চলে গেলে আবার অন্ধকার হয়ে আসছে।

বাতাস সামলাতে সামলাতে মিলি বলল, "এত বাতাস ভাল লাগে না।... যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

কান্তি প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছিল, মাথা সামান্য নোয়ানো। ম্লান জ্যোৎস্নায় আরও ম্লান দেখাচ্ছিল তাকে।

মিলি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন, রাস্তার উঁচুনীচু, পাথর, জল তার পা আরও ভারী করে ফেলেছে।

"ছেলেবেলায়," মিলি বলল, "আমার একটা খারাপ অভ্যেস ছিল। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ মনে হত আমি উড়ে যাচ্ছি, ঝড় এসে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতাম, বিছানাটিছানা আঁকড়ে ধরতাম। মা পিসিমাকেও কতবার আঁকড়ে ধরেছি।"

কান্তি মুখ তুলে বলল, "সে অভ্যেস আর নেই?"

"না।"

"তুমি মাঝে মাঝে আমায় আঁকড়ে ধরো।"

"না না, সে হয়ত এমনি...। আমার বিছানা ছোট; দুজনের শোবার মতন নয়। হাত পা ছড়াতে গিয়ে লেগে যায়।"

"তোমার বিছানা খুব ছোট নয়," কান্তি হাসবার মতন করে বলল।

মিলিও যেন কী মনে করে হাসল। "তুমি যে আমার আঁকড়ে ধরো না কি করে জানলে?"

"জানি না। ধরতে পারি। নেশার মধ্যে কি হয় কেমন করে বলব।"

"আমিও ঠিক ঠিক জানি না। বোধ হয় নেশার মধ্যে আমারও মনে হয়

ব্যথাটা সয়ে আসছে, তখন আরাম পাবার মতন করে গা এলিয়ে দিই।"

"তোমার ব্যথা সত্যি সত্যিই হয়?"

"হয় না?"

"তুমি জানো। তোমার ব্যথা।"

বড় রাস্তার কাছাকাছি পেণছৈ মিলি আচমকা বলল, "এই ব্যথাই আমার সব খেল।...কতদিন থেকে ভুগছি, জান?...আর ভাল লাগে না।"

কান্তি মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলল না। দেখল, ঝিলের চাঁদ তাদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

আট

গলির মুখে রিকশা ঢুকতেই মিলি ব্রজসুন্দর মেডিকেল স্টোর্স-এর কালীপদকে দেখতে পেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যগ্র চঞ্চল ভাব। মিলি অবাক হল। কালীপদর আসার দিন আজ নয়। এ সময়ে সে আসেও না। কিছুই বুঝতে পারল না মিলি, এইমাত্র বুঝল, কালীপদ তার জন্যেই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। রিকশা থামল না, থামাতে বলল না মিলি; পাশে কান্তি।

বাড়ির সদরে গিয়ে রিকশা থামার পর মিলি নামল। কান্তি নেমে পড়েছে। ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে মিলি গলির দিকে তাকাল, দূরে কালীপদ আসছে।

কান্তির হাতে চাবির গোছা তুলে দিয়ে মিলি বলল, "ঘর খোল গে যাও, আমি আসছি।"

কান্তি গলির দিকে একবার তাকিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

গলিতে যে অল্পস্বল্প আলো তাতে দূর থেকে কালীপদর হাঁটার ভঙ্গি বোঝা যায় না। তবু মিলির মনে হল, গলির মুখে আলোর কাছে যেভাবে ব্যগ্র হয়ে কালীপদ দাঁড়িয়ে ছিল তার তুলনায় এখন তার হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততা নেই। আস্তে আস্তে আসছে। কেন আসছে মিলি তাও বুঝতে পারল। কান্তির জন্যে। কালীপদ কান্তির সামনাসামনি হতে চায় না। মিলি নিজেও অবশ্য সেটা চায় নি।

সদরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মিলি।

কালীপদ যখন কাছাকাছি তখন মিলি কেমন উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। সামনে এসে দাঁড়াল কালীপদ।

"এ-রকম সময় আপনি?" মিলি সন্দেহের চোখে কালীপদকে দেখছিল।

কালীপদ মিলির মুখ দেখতে দেখতে বলল, "দু-বার এসে ফিরে গিয়েছি, দিদি। বিকেলে এসেছি, আবার সাঁঝ বেলায়। গিছলেন কোথায়? এবার এসে আধ ঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে আছি।"

মিলি কোনো কথার জবাব না দিয়ে বলল, "কী দরকার আপনার?"

কালীপদ দু-মুহূর্ত সামলে নিয়ে বলল, "দরকার খুব।"

"কী?"

"গরীব মানুষের একটা উপকার করতে হবে।"

কালীপদর কথাবার্তার ভঙ্গি সরল বলে মনে হচ্ছিল না। বিরক্ত বোধ করে মিলি বলল, "কী উপকার?"

কালীপদ আবার একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি চেষ্টা করলেই হয়ে

যায়।”

কালীপদর ভণিতা পছন্দ হল না মিলির। “কী উপকার না জানলে...”

সামান্য মাথা নাড়ল কালীপদ। “বলছি। এ-কাজটা আপনাকে করে দিতেই হবে, দিদি। সবার আগে আপনার কথা মনে পড়ল। বিকাল থেকে আসছি যাচ্ছি।”

লোকটা যে বিপদে পড়েছে তাতে মিলির সন্দেহ হল না। সামান্য ব্যাপার নিশ্চয় নয়। দোকান ফেলে কালীপদ বার বার আসা যাওয়া করছে যখন তখন বড় কিছুই হবে। কিন্তু লোকটা সরাসরি বলছে না কেন?

“আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—” মিলি বলল।

“কান্তিবাবু?”

“আপনার কী দরকার বলুন!” মিলি রুক্ষভাবে বলল।

কালীপদ আরও দু পা সরে এল, গলির এপাশ ওপাশ তাকাল, লোকজন আসাযাওয়া করছে। সদরের চৌকাটে গিয়ে দাঁড়াল আবার। “এক পা এদিক পানে আসুন দিদি।”

মিলি চৌকাট ঘেঁষে দাঁড়াল।

কালীপদ খুব নীচু গলায় বলল, “এক জায়গায় যেতে হবে, দিদি।”

“আমায়? কেন?”

“আপনি না গেলে হবে না।”

“কেন যাব, কোথায় যাব কিছুই বলছেন না—খালি অকারণ কথা—” মিলি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

ঢোঁক গিলল কালীপদ। নীচু গলায় বলল, “একটা মেয়ের কাল থেকে—ইয়ে —মানে রক্তপাত হচ্ছে, মর মর অবস্থা...”

মিলি তীক্ষ্ন চোখে কালীপদর দিকে তাকাল। কালীপদর মুখ, চোখ, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি রক্তপাতের ইতিহাস প্রকাশ করে দিচ্ছে। বেশী কথা শোনার দরকার করে না। মিলি তার অভিজ্ঞতায় এসব বেশ বোঝে। তবু সেই মুহূর্তে হঠাৎ কেমন নিষ্ঠুর হয়ে, যেন কিছুই বোঝে নি, অজ্ঞতার ভান করে বলল, “রক্তপাত হচ্ছে! এত রক্তপাত কেন? কী হয়েছে মেয়েটার? হাসপাতালে নিয়ে যান।”

কালীপদ বুঝতে পারল মিলি ইচ্ছে করেই অজ্ঞতার ভান করছে। বলল, “অবস্থা থাকলে হাসপাতালে নিয়ে যেতাম।”

“অবস্থা যেমনই হোক নিয়ে যেতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি করেছে, তাতে করে নিয়ে যান। না হলে রেলের অ্যাম্বুলেন্স আছে—কাউকে ধরে করে সেটা যোগাড় করুন।...”

মাথা নাড়ল কালীপদ। অধৈর্য। বলল, “না না, ওসব কোনো কাজের কথা নয়। গোলমাল হয়ে যাবে।”

মিলি উৎসাহ দেখাল না। “গোলমাল আবার কি হবে? ব্লিড করছে। হাস-

পাতালে নিয়ে গেলেই ভরতি করে নেবে।”

কালীপদ মিলির হাত ধরে ফেলার মতন করে ঝুঁকে গেল। “দিদি, ব্যাপারটা গোলমেলে, হাসপাতালে যেতে পারব না। থানা পুলিস হয়ে যাবে।”

দু-মুহূর্ত চুপ করে থেকে মিলি কঠিন গলায় বলল, “কে হয় আপনার?”

“আমার কেউ নয়, নিজের কেউ নয়। জ্ঞাতি সম্পর্কে আত্মীয়।”

“আইবুড়ো না সধবা?”

“সধবা।”

“তা হলে ভয় কিসের?”

কালীপদ এবার ঘা খাওয়া কুকুরের মতন কুঁকড়ে গিয়ে বলল, “দিদি, আপনাকে সত্যি বলছি, চণ্ডী মায়ের দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কোনো দোষ নেই। আমার খুড়তুতো ভাইটা বরফ কারখানায় কাজ করে। মাইনেপত্র সামান্য। দু-দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে গত তিন বছরে। শালাকে কত বলেছি, সাবধান করে দিয়েছি, তবু শুয়োরের বাচ্চা খিল আটকে রাখল না। প্রথম প্রথম আমায় বলে নি, যখন বলল—তখন দু তিন মাস চলছে। তা আমি শালাও তেমন মুখ্যু ভাইয়ের বউ, ভাই, কচি কচি বাচ্চাগুলোর কথা ভেবে—একটা ওষুধ দিলাম খেতে…।”

“আপনি?”

“ওষুধটা যে এমন করবে…”

“কী ওষুধ? কোথায় পেলেন?”

কালীপদ যে ওষুধের নাম বলল, মিলি তার জীবনে সে-নাম শোনে নি। হাতুড়ে ওষুধ। কলকাতা থেকে কিনে আনিয়ে কালীপদ এখানে তার ব্যবসা চালায় বলে মনে হয়।

মিলি বলল, “ডাক্তারখানায় বসে বসে আপনি যত হাতুড়ে, ভেজাল, নকল ওষুধ কিনে এনে খাওয়াবেন, এখন বুঝুন।”

“আমি খাওয়াই, না মালিক খাওয়ায়। আমি শালা মালিকের চাকর; দুটো পয়সার জন্যে দেবতাকে তুষ্ট করি।…তা যাক, ওই ওষুধও এখানে চলে দিদি, আলতু ফালতু গরীব মুখ্যুরা অত কি বোঝে! ফ্যাসাদে পড়ে তারা নিয়ে যায়। কি করে বুঝব—”

“আপনি কেন বুঝবেন! যার বোঝার সে বোঝে।…যাকগে, ওই মেয়েকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভরতি করে দিন। নয়ত মারা যাবে।”

“হাসপাতালে নিয়ে যাই কি করে?”

“নিয়ে যান। যা হোক মিথ্যে একটা কিছু বলবেন। পড়ে গেছে কিংবা ওই রকম কিছু বলবেন।”

“তা তো বলা যেত! কিন্তু সেই শালী বলছে—সে সব বলে দেবে। তাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হয়েছে…উন্মাদ হয়ে গেছে হারামজাদী, চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে, গালাগাল করছে।”

মিলির সন্দেহ হল, কালীপদ শুধু ওষুধই খাওয়ায় নি, আরো কিছু

আছে।

মিলি বলল, "আমি গিয়ে কিছু করতে পারব না। আমি ডাক্তার নই। হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বিপদ হবে। মেয়েটা মারা যেতে পারে।"

কালীপদ আরও গলা নীচু করে কি যেন বলল।

চমকে উঠল মিলি। মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, আপনি পাগল নাকি। ও আমি পারব না। আমি ডাক্তার নই।"

"একটা ডাক্তার ধরে দিন। কোনো অসুবিধে হবে না।"

"না", মিলি মাথা নাড়ল, "তেমন ডাক্তার আমার জানা নেই।"

"কেন ধোঁকা দিচ্ছেন দিদি, হাসপাতালে কি হয় আমরা জানি না। রক্তপাত করে মেয়েরা যায় না? আপনারা তাদের বাঁচান না। কত কেস চাপা দিয়ে দেন..। আমাদের কানেও খবর আসে, দিদি।"

মিলির অসহ্য লাগছিল। রুক্ষভাবে বলল, "তা হলে নিজেই খুঁজে নিন গে যান। যান।"

"আপনি যাবেন না?"

"না।"

"হাসপাতালের ডাক্তারকে অন্তত একটু বলে-টলে ব্যবস্থা করে দিন।"

"না; না।"

কালীপদ খেপা জন্তুর মতন চোখ করে মিলিকে দেখতে লাগল। "মাগনায় আপনাকে খাটাব না।"

মিলির ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটাকে ধাক্কা মেরে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। রূঢ় গলায় বলল, "সরুন, আমায় যেতে দিন।"

কালীপদ দরজা ছেড়ে নড়ল না। দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে বলল, "নিজের পায়ে কুড়ুল মারছেন দিদি।"

মিলি রাগে কাঁপছিল। বলল, "আপনি মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। যদি ভালোয় ভালোয় চলে যান—ভাল কথা। গণ্ডগোল করলে আমি আপনাকে থানা পুলিস্ করাব।"

কালীপদ রাস্তায় চাপা পড়া কুকুরের মতন চেঁচাতে যাচ্ছিল, কিংবা আক্রোশে মিলিকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিলি কালীপদকে ডিঙিয়ে সদরের মধ্যে ঢুকে গেল।

কালীপদ বলল, "আচ্ছা শালী, খানকি, তোকে আমি দেখাব।"

ঘরে ঢুকে মিলি কান্তিকে দেখতে পেল না। বাতি জ্বলছে। পাশের ঘরেও আলো। রাগে ঘেন্নায় মিলির গা জ্বলে যাচ্ছিল, মাথা আগুন হয়ে গেছে। লোকটার কী স্পর্ধা, মিলির বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে শাসিয়ে গেল, গালাগাল দিয়ে গেল। ছোটলোক, ইতর, হারামজাদা কোথাকার। তুমি শয়তান ভাইয়ের বউয়ের পেট খসালো, তার জন্যে আমি মরব! লোকটার মুখে জুতো মারা উচিত ছিল।

বদমাশ, বেজন্মা, হারামজাদা। রাগে এমন করছিল মাথাটা যে মিলি বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল।

কান্তি কলঘরে গিয়েছিল, ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়েছে ভাল করে, ঘাড়ে মাথায় মুখে জল।

"নীচে এতক্ষণ কী করছিলে?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

মিলি জবাব দিল না।

মুখটুখ মুছতে লাগল কান্তি, মুছতে মুছতে মিলির দিকে তাকাল। আগে লক্ষ করে নি; এখন লক্ষ পড়তে দেখল, মিলির মুখ যেন ঝলসানো। "কী হল তোমার?"

সাড়া দিল না মিলি।

গায়ের জামা আগেই খুলে ফেলেছিল কান্তি। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল। খালি গা। প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরবে।

"ওই লোকটা কেন এসেছিল?" কান্তি বলল।

মিলি তাকাল। "কে?"

"ডিসপেনসারির লোকটা।"

"তুমি চেন?"

"চিনি। তোমার কাছে আসে মাঝে মাঝে।"

মিলি কোনো দিনই কান্তির সামনে কালীপদর সঙ্গে লেনদেন করে নি। কালীপদর আসার সময় দুপুরে বা বিকেলের গোড়ায়। কান্তি তখন এ বাড়িতে থাকে না। তবু কান্তি জানে। কি করে জানল? কে জানাল? কোনোদিন দেখেছে নাকি? মিলির কাছে কে আসে যায়—কান্তি কি তার খোঁজ রাখে নাকি লুকিয়ে? মিলির মাথা আরও গরম হয়ে গেল। কী মনে করে কান্তি? মিলি তার কেনা মেয়েছেলে, না ঘরের বউ যে লুকিয়ে লুকিয়ে মিলির চরিত্র লক্ষ করছে।

"আমার কাছে আসে। তাতে কি হয়েছে?" মিলি রুক্ষভাবে বলল।

কান্তি একপাশে দাঁড়িয়ে পাজামা পরে নিচ্ছিল। কোমরের ফিতেটা বেঁধে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। "লোকটা তোমার মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গেল, তাই বলছি।"

মিলি আরও একটু বসে থেকে উঠে দাঁড়াল। এভাবে বসে থাকলে আরও রাগ চড়বে, মাথায় রক্ত উঠে যাবে। কান্তি তাকে দেখবে, সন্দেহ করবে, খোঁচাবে। নিজেকে সামলাবার জন্যে মিলি তাড়াতাড়ি আলনার কাছে গিয়ে ঘরে পরার শাড়ি জামা তুলে নিল, নিয়ে চলে গেল।

ততক্ষণে কান্তি একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়েছে, মিলি চলে যাবার পর সটান বিছানায় এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

কলঘরে বেশ দেরিই করল মিলি। অত রাগ, বিতৃষ্ণা, জ্বালা, ঘৃণা সহজে যাবার নয়। তবু জলের ঝাপটায় চোখ মুখ সামান্য ঠাণ্ডা হল। শোবার ঘরে এসে মিলি

দেখল, কান্তি চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে। কান্তির চুপচাপ শুয়ে থাকাটাই ভাল, মিলি অন্তত তাতে স্বস্তি পাবে। ছাড়া শাড়ি জামা রেখে, মুখ মুছে মিলি পাশের ঘরে চলে গেল আবার। খাবারদাবার গরম করতে হবে। কান্তির কাছাকাছি থাকার চেয়ে আড়ালে থাকাই পছন্দ করছিল মিলি। স্টোভ জ্বালিয়ে নিয়ে বসল।

কালীপদ তাকে ছাড়ছে না। ঘুরে ফিরে সেই হারামজাদা ঠিক তার মাথায় এসে বসছে। মিলির বাড়িতে এসে শাসিয়ে যাবার স্পর্ধা তার কি করে হল, মিলি বুঝতে পারছে না। যদি এমন হয়, মিলি হাসপাতাল থেকে ওষুধ চুরি করে এনে বেচে বলেই কালীপদর এত সাহস হয়ে থাকে—তবে সে পাজী হতচ্ছাড়াই বা কোন সাধু পুরুষ? তুমি চোর নও? তোমার মালিক চোর নয়? তোমার ওষুধের দোকান জোচ্চোরের নয়? কী করবে কালীপদ তার? ওষুধ নেবে না? না নিক—তাতে মিলি মরে যাবে না। কালীপদ মিলির নামে হাসপাতালে গিয়ে লাগাতে পারে, একে-তাকে বলতে পারে। হাসপাতালে মিলি কি একাই চোর? আর চোর নেই? চুরি হয় না? স্টোরে চুরি হয় না? অন্য ওয়ার্ডে চুরি হয় না? খাবার-দাবারে চুরি হচ্ছে না? কোথায় যায় মাছ দুধ, কোথায় যায় সরকারী ওষুধ? বড় বড় চুরি আরও ওপর তলায়। সেখানে পুকুর চুরি যায়। মিলি তো ছিঁচকে চোর। সবাই চোর। কেউ বড়, কেউ ছোট।

খাবারদাবার গরম করা হয়ে গিয়েছিল। মিলি সেই স্টোভেই জল বসিয়ে দিল, ইনজেকসানের সিরিঞ্জ টিরিঞ্জ গরম করে নেবে। হাসপাতাল থেকে একটু অ্যালকহল আনতে পারছে না, নয়ত এ ঝঞ্ঝাট রোজ রোজ ভাল লাগে না, এই জল ফোটানো। গত হপ্তাটা মিলি বেশ কাটিয়েছে, রাত্তিরে ডিউটি, শরীর এক এক সময় যেন ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে তবু নেশাটা করে নি, অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছে নিজেকে; একদিন শুধু অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল বলে ওষুধ খেয়েছিল।

খেতে বসেও মিলি খুব সাবধানে থাকল। মুখ চোখ এমন গম্ভীর করে রাখল যেন কান্তি কোনো কথা পাড়ার সুযোগ না পায়। অন্য ধরনের কথা নিজেই বরং বলল মিলি, অকারণ কথা, যাতে কান্তি কালীপদর কথা তুলতে না পারে। কান্তিও কথা তুলল না।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে মিলি যখন সব গুছিয়ে শোবার ঘরে এল, কান্তি তখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

মিলি ওষুধপত্র গুছিয়ে রেখে নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

কান্তি সিগারেট শেষ করে বিছানায় গিয়ে বসল।

মিলি বলল, "আমার শরীর ভাল লাগছে না। শুয়ে পড়ব।"

"কি হয়েছে?"

"ব্যথা ব্যথা লাগছে।"

"কোথায়?"

মিলি চোখ তুলে কান্তির দিকে তাকাল। ঠাট্টা করছে কান্তি? মিলি বলল,

"যেখানে ব্যথা ব্যথা লাগে।"

"ও!"

সিগারেটটা শেষ করল না মিলি ; নিবিয়ে দিল। এবার তার অসহ্য লাগছে। যেন সারা শরীরের মধ্যে থেকে কেমন এক অবসাদ হতাশা ক্লান্তি তাকে একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। ব্যাকুলতা বোধ করছিল মিলি। উৎকণ্ঠা। কেমন এক আকুলতা।

মিলি আর দেরি করল না; পেথিডিনের অ্যাম্পুল ভেঙে নিল।

কান্তি অপেক্ষা করতে লাগল। মিলি দিনের পর দিন কৃপণ হয়ে উঠছে, কান্তিকে কম দিচ্ছে। নেশা ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। বলছে, মরতে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরো, এই নেশায় মরো না। কান্তিকে ভদ্রলোক করে তুলতে চাইছে মিলি। আজকাল হপ্তায় দু দিনও হয় না। মিলি হাসপাতালে থাকলে একেবারেই নয়।

হাত বাড়াল কান্তি।

মিলি এগিয়ে এল। সিরিঞ্জ হাতে তুলোর টুকরো নিয়ে মিলি যখন এগিয়ে আসে—কান্তির মনে হয়, মিলির মুখে যেন কেমন নিস্পৃহ উদাসীন ভাব রয়েছে; কখনো কখনো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে চোখ দুটো।

কান্তির নেওয়া হল। "কম দিলে।"

"আমার হিসেব আছে।"

মিলি পায়ের কাপড় তুলে নিজেরটা নিতে লাগল। কান্তি নিজের হাত দেখছিল। এক ফোঁটা রক্ত এসেছে।

কতক্ষণ কেউ বলতে পারবে না, অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে দু জনেই প্রায় একসঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। পরস্পরের শ্বাস তারা শুনতেও পেল।

কান্তি হাসির গলায় বলল, "বাঃ! এক সঙ্গেই—?"

মিলি সাড়া দিল না।

কান্তি শুয়ে থাকতে থাকতে মিলির দিকে পাশ ফিরে বলল, "তোমার ব্যথা কমছে?"

"কমবে।"

মিলির জামায় হাত দিল কান্তি। "ব্যথাটা কোথায়?"

"যেখানে হয়। আমায় জ্বালিয়ো না। আমার ভাল লাগছে না।"

"ওই ডিসপেনসারির লোকটা তোমায় খুব জ্বালিয়ে গেল, না?"

"হ্যাঁ।"

"কি বলল?"

সাবধান হল মিলি। "ওর একটা দরকার ছিল।"

"কী দরকার?"

কথা বলল না মিলি।

কান্তি মিলির কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল। "ওই লোকটা তোমার কাছে কেন আসে? কিসের দরকার ওর?"

কান্তির হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল মিলি। "আঃ, কেন জ্বালাচ্ছ! ঘুমোতে দাও আমায়। সরো।" বলে মিলি পাশ ফিরে গেল, কান্তির দিকে পিঠ করল।

কান্তি আরও ঘেঁষে গেল। "লোকটাকে আমি চিনি। ভাল করে চিনি। ওর মালিককে চিনি; ডিসপেনসারি চিনি।"

"চেন বেশ করো। আমার তাতে কী!"

"আমি জানতে চাইছি লোকটা কেন এসেছিল?" কান্তির হাত মিলির কাঁধের ওপর থেকে ঘাড়ের দিকে সরে গেল, আঙুল ফাঁক করে ধরলে গলাও ধরা যায়।

মিলি কান্তির হাত সরিয়ে দেবার জন্যে বাঁ হাত পিঠের দিকে বেঁকিয়ে কান্তির হাত ঠেলে দিল। "লোকটা আমার কাছে কেন আসে তার কৈফিয়ত তোমায় দিতে হবে?"

"বলোই না," কান্তি ঠাণ্ডা গলায় বলল।

"না, বলব না। তুমি আমার কে? তোমার আমি খাই পরি?"

"আমি জানি, ও কেন আসে।"

মিলি আগের মতন শুয়ে থাকল, কিন্তু অনুভব করতে পারছিল—কান্তি তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। বেপরোয়া হয়ে যেন মিলি বলল, "জান গে যাও।"

"তুমি ওর সঙ্গে ব্যবসা কর", কান্তি বলল।

মিলি তিক্ত গলায় বলল, "তুমি কি আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছ? আমি কি করি না করি—সে দেখে?...হ্যাঁ, আমি কালীপদর সঙ্গে ব্যবসা করি। আমার মতন মেয়েরা ব্যবসাই করে।"

কান্তি মিলির কোমরের কাছটায় আচমকা খামচে ধরল। কাপড় ছিল না কোমরে, এলোমেলো হয়ে ছিল শাড়িটা, মিলির কোমরের ভাঁজে হাত পড়ে গেল কান্তির। "তুমি ওর কাছে ওষুধ বেচ।"

মিলি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও অন্ধকারে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুকে ধক্ করে কি লাগল। ভয়? নাকি চমক? না কোমরের কাছে কান্তি যেভাবে খামচে ধরেছে তার ব্যথা? তার পুরোনো ব্যথাও তো পিঠ কোমর বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

"কি, বেচ না ওষুধ?" কান্তি মিলিকে আরও টানল।

"হ্যাঁ, বেচি। বেশ করি।"

কান্তি তার হাত মিলির কোমর থেকে গড়িয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেল। তারপর এমন করে টানল যে মিলিকে সোজা হয়ে যেতে হল। "এদিকে ফেরো।"

"না।"

"ও বেটা তোমার কাছে চোরাই মাল কিনতে এসেছিল।"

"না।" মিলি এবার কান্তির হাত ছাড়াবার জন্যে জোর করছিল। "ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও।"

"কেন এসেছিল তবে?"

"যে জন্যেই আসুক তোমার কি! তুমি আমায় ছেড়ে দাও।" মিলি বিছানার ওপর লাথি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উঠে বসল।

কান্তি আবার খপ করে ধরে ফেলল মিলিকে, ধরে বুকের ওপর টান মারতেই মিলি মুখ থুবড়ে পড়ল।

"হাসপাতাল থেকে ওষুধ চুরি করে এনে তুমি বেচে দাও। আমি জানি। তুমি পয়সা কামাচ্ছ, এ্যাঁ—?"

"বেশ করছি কামাচ্ছি।" মিলি দু হাতে কান্তির মুখ চেপে ধরে যেন থেঁতলে ফেলার মতন করছিল। পারছিল না। তার শক্তি কমে এসেছে। বড় অবসাদ লাগছিল। "আমি একাই কামাই না, অনেকে কামায়। সবাই কামায়। তুমি শালাও আমার দেরাজ থেকে টাকা চুরি করো।"

কান্তি মিলির হাত মুখ থেকে ছাড়িয়ে দু পায়ে মিলিকে সাঁড়াশির মতন আটকে নিয়ে একেবারে বুকের ওপর ফেলে নিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি মাইরি খেপে যাচ্ছ কেন! তুমি চোর, তুমি খচড়া, আমিও শালা চোর, শয়তান। সব বানচোত চোর। আমি তোমায় কিছু বলছি না। তুমি যত পার চুরি করো, দু হাতে কামাও, কিন্তু ওই লোকটার সঙ্গে ঝমেলায় পড়লে আমায় বলো।"

এই অবস্থাতেও মিলির হঠাৎ খেয়াল হল কালীপদ তাকে শাসিয়ে গেছে, ঝামেলা করতেও পারে। যদি করে তার অবলম্বন কী হবে? কান্তিই তার অবলম্বন হতে পারে। হ্যাঁ, পারে। এই শহরে সে যে এক রকম নিরাপদে আছে তার একটা কারণ কান্তি; লোকে জানে মিলির সঙ্গে কান্তির শোয়া-বসা আছে।

মিলি হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। বেয়াড়াভাবে কান্তির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল।

কান্তিও চুপ। মিলির মুখ তার বুকের ওপর, মিলির পেট উরু তার কোমর আর পেটের মধ্যে জড়ানো, পা দুটো দুপাশ থেকে মিলিকে জাপটে তার পেছনের ওপর চেপে আছে।

কেমন যেন হল কান্তির, মিলির গা থেকে পায়ের চাপ সরিয়ে নিল, হাত ছেড়ে দিল। মিলি আরও একটু একই ভাবে পড়ে থেকে উঠে বসে আবার শুয়ে পড়ল। কান্তির দিকে মুখ করেই।

কথাবার্তা হচ্ছিল না আর। মিলির ঘুম আসতে লাগল। আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল সে। কান্তি হাই তুলল, হাত ওঠাল মাথার দিকে, চোখ বুজল। আবার চোখ খুলল।

মিলি ছটফট করল, পাশ ফিরে গেল। গায়ের শাড়ি একেবারে খুলে ফেলল।

সায়ার দড়ি আলগা করে দিল। তার সেই ব্যথা—, সেই পুরোনো ব্যথাটা আসছে। মিলি যেন সমস্ত মনকে টেনে এনে ব্যথার কাছে এগিয়ে দিতে চাইছিল।

অথচ ব্যথা আসার কথা নয়। আসা উচিত নয়।

মিলি ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মুখ হাঁ করে বড় বড় শ্বাস নিল। তারপর কেঁদে ফেলল।

কান্তি ঝিম ধরে শুয়ে ছিল। মিলির কান্না শুনতে পেল কি পেল না, নাকি শুনেও গ্রাহ্য করল না বোঝা গেল না।

মিলি ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করল, অস্পষ্ট করে কিছু বলল, তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল।

কান্তি ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতে মিলিকে উঠতে হল। কলঘর থেকে ফিরে আসার সময় দেখল, ভোর হয়ে আসছে। এখনও সব অসাড়। আকাশের আঁধার কিছুটা পাতলা। ঘরে বাতি জেবলে রেখে গিয়েছিল। ফিরে এসে জল খেল। বাতি নিবিয়ে দিতে গিয়ে বিছানার দিকে চোখ পড়তেই দেখল, কান্তি অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে, উপুড় হয়ে—বিছানার একেবারে ধার ঘেঁষে। ওর মাথার তলার বালিশ নেই, একটা হাত খাটের পাশে ঝুলে আছে। এভাবে কেউ শুয়ে আছে দেখলে মনে হয়, মানুষটা মরে গেছে। ঘুম জড়ানো ঝাপসা চোখে আরও স্পষ্ট করে মিলি কিছু দেখতে পাচ্ছিল না বলে বিছানার কাছে এগিয়ে এল। কাল রাত্রে ধামসা-ধামসির সময় বালিশটা বোধ হয় খাটের মাথার দিকে উঠে গিয়েছিল, সরেও গিয়েছিল, কান্তি ঘুমের ঘোরে বালিশটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে। বালিশ তুলে বিছানায় রাখল মিলি, কান্তির ঝুলে পড়া হাত তুলে দিল; দিয়ে ঠেলে ঠুলে লোকটাকে স্বাভাবিকভাবে শুইয়ে দিল। কান্তিকে সোজা করে শুইয়ে দিতেই মিলির চোখে পড়ল, কান্তির গালের কাছে আঁচড়, চোখের পাশে দাগ, ঠোঁট এবং দাঁতের মধ্যে রক্তের ডেলা জমে আছে একটু। মিলি যে কাল ওই মুখটাকে কীভাবে আঁচড়ে, খামচে, থেঁতলে দিতে চেয়েছিল এখন তা বোঝা যায়। কান্তির এই মুখও এখন বড় আশ্চর্য লাগছিল—ঘুমিয়ে আছে তবু সমস্ত মুখে কেমন দুঃখ অশান্তি কষ্টের ছাপ।

বাতি নিবিয়ে দিতে উঠে গেল মিলি। টানা টানা হাই উঠল, শব্দ করে হাই তুলতে তুলতে বাতি নিবিয়ে দিল মিলি। অন্ধকারে দু মুহূর্ত দাঁড়াল, তারপর বিছানায় এসে বসল। তার মাথার চুল খুলে পড়েছে, সাদা-মাটা বিনুনিটা পিঠের ওপর, কান্তি কাল এমন করে তার বিনুনির গোড়া ধরে টান মেরেছিল যে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল মিলি। বিনুনি তখনই খুলে গেছে। বিছানায় শুয়ে পড়ার আগে বিনুনিটাকে সরিয়ে বুকের ওপর টেনে নিতে নিতে ব্লাউজের সেফটিপিনে হাত পড়ল। সেফটিপিন জামায় দিয়ে কান্তির পাশে শোয়া উচিত নয়।

মিলির হঠাৎ কেমন যেন হাসি পেল। ওর কাছে কী আর লুকোবে মিলি। কান্তি তার সমস্ত কিছুই একে একে জেনে গেছে। মিলির জীবনের দশ বারো আনা তো আগেই জেনেছিল, মিলির জন্মকর্ম, মিলির মা-পিসির বৃত্তান্ত, মিলির নেশা, মিলির সাধ। বাকি যা ছিল তারও খানিকটা জেনে গেল। জেনে গেল, মিলি চোর, মিলি হাসপাতালের ওষুধ চুরি করে এনে টাকা কামায়।

কান্তি তাকে ভাল নজরে দেখে মিলি আগে কোনোদিনই তা ভাবে নি। মিলির মত মেয়েকে ভাল নজরে দেখার মতন কিছু নেই। তবু মিলির মনে হচ্ছিল, আজ সে যেমনভাবে ধরা পড়ল এমন করে আগে কান্তির কাছে ধরা পড়ে নি। কান্তি তাকে বিশ্বাস করে না। মিলির ওপর কান্তির মায়া, মমতা, বিশ্বাস, ভরসা—কোনো কিছুই নেই। মিলির নিজেরও কি আছে কান্তির ওপর? না, বিন্দুমাত্র নয়। কান্তিকেও মিলি বিশ্বাস করে না। যে মানুষ নিজের বাপকে খুন করতে যায়, তার চেয়ে বড় শয়তান, পশু আর আছে নাকি?

এত মানুষ থাকতে ওই জন্তুটা যে কি করে মিলির কাছে এসে জুটেছিল কে জানে! এই শহরে মিলি বছর তিন রয়েছে। এখানে আসার পর তার দিকে চোখ দিয়েছিল দু চার জন। হাসপাতালের মেয়ের ওপর রাস্তার লোক চোখ দেবে এটা নতুন কিছু নয়। কার ওপর না দেয়, গেরস্থ ঘরের মেয়েদের ওপর দেয়, পাড়ার বউঝিদের ওপর দেয়, স্কুলের দিদিমণিদের ওপর দেয়, হাসপাতালের নার্সটার্সদের ওপর দেয়। তবু মিলি দেখেছে, তারা যেন নজর দেবার সস্তা জিনিস। যাক্ গে।...মিলির ওপর নজর যারাই দিক, মিলি কারও ওপর দেয় নি। পুরুষমানুষ তার দরকার ছিল না। সে ছেলেমানুষ নয়, পঁচিশ বছর বয়েস পর্যন্ত পেঁাছতে সে যা যা জানার জেনেছে। যে যে ঘা খাওয়ার খেয়েছে। এখন আর এসবে তার গা ছিল না। শরীরের তলায় যখন তাত লাগে তখন ছটফট করার মতন মেয়ে সে নয়। সেই বিশ্রী লাগার সময়টা সে কাটিয়ে দিতে জানে। তার জন্যে পুরুষ মানুষের দরকার হয় না। তাছাড়া নিজের শরীর নিয়ে মিলির লজ্জা বা গোঁড়ামি, খুঁতখুঁতুনি ছিল না। ওসব সে গ্রাহ্য করত না।

কান্তিকে মিলি ধরে আনে নি। কান্তি নিজেই এসেছিল। এল বড় আশ্চর্যভাবে। এভাবে কেউ আসে না। এখনও মিলির স্পষ্ট করে সেকথা মনে আছে। তখন শীতকাল, মিলি হাসপাতাল থেকে ফিরছে, কাজকর্মে দেরি হয়ে গিয়েছিল, প্রায় আটটা বাজে, ফেরার পথে মিলি দেখল, কান্তি একটা রিকশার ওপর এমনভাবে শুয়ে আছে যে, যে কোনো সময় গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে। রিকশঅলাকে আশেপাশে নজরে পড়ল না। পালিয়ে গেছে কিনা কে জানে। বমি করছিল কান্তি। মাথা তুলতে পারছিল না। তুলছিল না।

মিলি যেন কৌতূহল বোধ করেই দাঁড়াল। কান্তিকে সে নামে এবং চেহারায় চেনে। সারা শহরে তখন কান্তির কথা, শচীন মজুমদারের ছেলে বাপকে খুন করতে গিয়েছিল—এই কথাটা মুখে মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দয়া নয়, মায়া নয়, মমতা নয়—নিতান্তই যেন লোকটা এই শীতের দিনে নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা রিকশায় টাল হয়ে শুয়ে বমি করতে করতে মরে যাবে ভেবে মিলি কান্তিকে দেখতে গেল। এমন ভয়ও তার হয়েছিল, লোকটা বিষটিষ খেয়েছে।

দেখতে গিয়েই মিলি বুঝল, কান্তি একেবারেই বেহুঁশ, মদের গন্ধ চারপাশে থম্ মেরে রয়েছে, এমন অবস্থা যে একটা ধাক্কা মারলেই রিকশা থেকে গড়িয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়বে। রিকশাঅলা বোধ হয় রিকশাও চালাতে পারে নি। ভয় পেয়েছে। কিংবা জলটল আনতে গেছে।

কিছু করার নেই। এক, হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেখানে পাঠিয়েই বা কী হবে?

মিলি নিজের গা বাঁচিয়ে ফিরে যাবার কথাই ভাবছিল, এমন সময় সেই রিকশাঅলা এসে হাজির। কোথা থেকে খানিকটা জল এনেছে।

জলটল দিতেই কান্তির টলে পড়া মাথা একটু নড়ল চড়ল, তারপর সে কাঁপতে লাগল।

রিকশাঅলা বলল, বাবুকা ভারি বোখার, মা জী।

মিলি বলল, ঘরে নিয়ে যাও।

রিকশাঅলা বুড়ো, শীতে নিজেই কাঁপছে, বাবুর ঘরও চেনে না।

আর না দাঁড়িয়ে মিলি চলে আসছিল। হঠাৎ পিছন ফিরতে দেখল রিকশাটা তার পেছন পেছন আসছে।

মিলি কিছুই বলে নি, বোঝেও নি প্রথমটায়। কিন্তু একসময় অবাক হয়ে মিলি দেখল, বুড়ো রিকশাঅলাটা তার পিছন পিছন সমানেই আসছে। শেষে গলিতেও ঢুকে পড়ল।

নিজের রিকশা থামিয়ে মিলি নেমে গেল। পেছনে কান্তির রিকশা দাঁড়িয়ে গেছে।

মিলি এগিয়ে এসে বলল, এই গলিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

বুড়ো রিকশাঅলা বলল, বাবু বোলা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মিলি। কান্তি তখনও বেহুঁশ, তবু খাবি খাওয়ার মতন মাঝে মাঝে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে।

কান্তি কোথায় থাকে মিলি জানে না, শচীন মজুমদারের বাড়িও চেনে না, শুনেছে মহুয়াবাগানে। কোথায় পাঠাবে কান্তিকে মিলি বুঝল না।

আবার রিকশায় ফিরে এল মিলি। রাগ হচ্ছিল তার, কি করবে বুঝতেও পারছিল না। চুলোয় যাক। মিলির কী!

নিজের বাড়ির সদরে মিলি নামল। ভাড়া মেটাচ্ছে, দেখল পেছনের রিকশাও এসে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করতে গিয়েও মিলি বেশী চেঁচাতে পারল না। কান্তি নিজেই যেন নামবার চেষ্টা করছিল, রিকশার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এত জোরে পড়ল যে শব্দটা মিলিকে চমকে ভয় ধরিয়ে দিল।

যদি বলো শনি, তবে এই শনি, এই পাপ মিলির বাড়িতে এসে ঢুকল। দুজন রিকশাওলা ধরাধরি করে পেঁৗছে দিয়ে গেল কান্তিকে।

নেশা, জ্বর, তার ওপর কপালে চোট, নাকের কাছে কেটে গেছে, ডান হাতের কবজি ফুলে গেছে। মিলি এই উৎপাত ঘরে ঢোকাতে চায় নি। কে চায়! তবু মিলির কপালে দুর্ভোগ ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তুলে নিতে হল। কান্তি শুধু মাতাল হয়ে বেহুঁশ হয় নি, তার জ্বরও হয়েছিল প্রচুর। পরের দিন বোঝা গেল জল বসন্ত বেরুচ্ছে। কোথাকার কে কান্তি, মিলির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই, পরিচয় নেই, যার নামে লোকে ছি ছি করে, ঘেন্না করে সেই মানুষটা দিব্যি মিলির বাড়িতে হাসপাতালের বিছানা বানিয়ে ফেলল। হাস-পাতালের মেয়েরা বলেছিল, তুমিও যেমন, হাসপাতালে দিয়ে দাও, না হয় দাও ওর বাড়িতে পাঠিয়ে, ওর বাপ বুঝবে। পদ্মজা শুধু বলেছিল : 'তুমি খাঁটি কৃশ্চান।'...মিলি ওসব খেস্টান টেস্টান বোঝে না। বুঝে তার দরকার নেই। হিন্দু হলেই বা কি, খেস্টান হলেই বা কি—সে যেমন মিলি, তেমন মিলিই থাকবে।

কান্তিকে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়েছিল মিলির। যেন ভগবান তাকে নাজেহাল করার জন্যেই এই রকম একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। কয়েকটা দিন কান্তি বড় ভোগাল। তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে এল। কান্তি সুস্থ হল, মিলি পড়ল, সেই জল বসন্ত।

মিলি ওই সময় বেশ বুঝতে পেরেছিল কান্তি কেমন একটা যন্ত্রণা, গ্লানি, আফসোস এবং বেঘোর অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তেমন একটা প্রকৃতিস্থ, স্বাভা-বিক মনে হত না কান্তিকে। সে যেন শচীন মজুমদারকে খুন করতে যাবার পাপ এবং গ্লানির মধ্যে ভুগছিল। বড় অশান্ত, চঞ্চল, অস্থির হয়ে থাকত, আকণ্ঠ মদ খেত এক একদিন। মাতলামি করত। চেঁচাত। রেগে যেত। গালা-গালি করত।

ওই অবস্থাটা কাটতে সময় লাগল। ক্রমশই যেন কান্তি খানিকটা থিতিয়ে আসছিল। মিলিই তাকে থিতিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল ওপর ওপর। বেশীরকম ছটফট করার সময় তাকে নতুন নেশা দিয়ে শান্ত করে দিতে লাগল। অবশ্য কান্তি প্রথমে বুঝত না, মিলি কী নেয়, কেন নেয়। মিলি বলত, ব্যথা ওঠে গল ব্লাডারের, তাই ওষুধ দিয়ে ব্যথা চেপে রাখে। কান্তি পরে বুঝতে পারল, ওটা নেশা। সে নেশার লোভে পড়ল।

মিলি যে কান্তিকে সাধ করে যেচে তার উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল তা নয়। তখন, সেসব দিনে মিলি এমন অসহায় হয়ে পড়ত যে তার মনে হত কান্তিকে ভুলিয়ে রাখার উপায় আর তার জানা নেই। কিংবা মিলি হয়ত, কান্তিকে—তার এই গোপন জীবনের সঙ্গী করে নিতে চাইছিল। বা, এমনও হতে পারে, মিলি কেমন একটা আক্রোশ অনুভব করত কান্তির

ওপর—। কিসের আক্রোশ, কি জন্যে আক্রোশ? কান্তির আভিজাত্য, কান্তির ভদ্রজীবন, তার শিক্ষা, রুচি, সামাজিক পরিচয়ের ওপর কি! হতে পারে। মিলি জানে না। সে হয়ত, অনেক কালের চাপা, বিকৃত,' কুৎসিত কোনো বাসনা চরিতার্থ করতে চাইছিল। কান্তি নিমিত্তমাত্র।

নয়

পুজো চলছিল। এই শহরের তিন চারটে পুরোনো পুজো ছাড়াও মহুয়া-বাগানে জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছিল। আকাশ বাতাস একেবারে দিব্যি ঝরঝরে, শেষ শরতের নীল মাখানো আকাশ, কোথাও কোথাও সাদা লঘু মেঘ আলস্যভরে শুয়ে আছে. রোদ ঝকঝকে, সন্ধ্যের বাতাসে হেমন্তের গন্ধ দিয়েছিল। শহরটা বরাবরের মতন খুশী খুশী হয়ে উঠেছে। বাজারের দিকটা গমগম করছে, সবচেয়ে পুরোনো পুজো কালীতলার মাঠে। রেলবাবুদের পুজো স্টেশনের দিকে রেল কলোনিতে। ছেলেছোকরারা পুজো করছে লাহিড়ী পাড়ায়। বিকেলের দিক থেকে আর রিকশা গাড়িঘোড়া পাওয়া যায় না। দলে দলে বউ বাচ্চা ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে একদল এনেছে যাত্রা, একদল কীর্তন। মহুয়াবাগান এনেছে কীর্তন। শচীন মজুমদার দেদার টাকা ঢেলে দিয়েছে মহুয়াবাগানের পুজোয়।

নবমী পুজোর দিন বিকেলের মুখে ত্রিদিব হন্তদন্ত হয়ে মিত্তিরদার দোকানে এসে হাজির। কান্তি দোকানের দোতলার সেই ফালি বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল আর রাস্তার ভিড়, গমগমে ভাবটা দেখছিল। এখনও অনেকটা ফাঁকা আছে, আর একটু সময় গেলে, সন্ধ্যের মুখোমুখি থেকে মনে হবে চারপাশে হট্টগোল, চিৎকার, হুড়োহুড়ি আর জনস্রোত ছাড়া এই শহরের কোথাও একটু নিরিবিলি শান্তভাব নেই।

ত্রিদিব এসে বলল, "এই, সিরিআস ব্যাপার। তুই একবার বাড়ি যা। মেসো-মশাইয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।"

"বাবার?" কান্তি চমকে উঠে তাকাল।

"তুই যা। তোর যাওয়া উচিত।"

কান্তি ত্রিদিবের মুখ দেখতে দেখতে বলল, "তোকে কে বলল?"

"নন্দ এসে আমায় বলে গেল।"

"তোর গ্যারেজ তো বন্ধ।"

"বাড়িতে এসে বলে গেছে দুপুরে।...কাল রাত থেকেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল, আজ একটু বেলায় অ্যাটাক হয়েছে।"

কান্তি কিছু বলল না। প্রথমটায় সে চমকে উঠলেও এখন ওপর ওপর নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। সিগারেট ধরাল কান্তি। "চা খাবি?"

ত্রিদিব অসহিষ্ণু হয়ে বলল. "তোর ব্যাপারটা কী? বাড়িতে একটা ক্রাইসিস..."

"আমি বাড়িতে গেলে আমার বাপ কি বেঁচে উঠবে, শালা?" কান্তি বলল, রুক্ষ ভাবেই। "ডাক্তারফাক্তার গিয়ে বসে আছে। কিশোরী মিত্তির রয়েছে। বাঁচবার হলে ওদের হাতেই বাঁচবে।"

ত্রিদিব যেন নির্বোধের মতন কথাগুলো শুনল, শুনে চুপ করে বসে থাকল। কান্তির এই ব্যবহার তার ভাল লাগছিল না। কান্তি এবং শচীন মজুমদারের সম্পর্ক, কান্তির মনোভাব তার সেই জঘন্য অপরাধ—ত্রিদিব সবই জানে। তবু, ত্রিদিব বুঝতে পারছিল না, মরা-বাঁচার প্রশ্ন যেখানে সেখানে কান্তি এমন নির্বিকার থাকে কি করে।

কান্তি হাঁক দিয়ে বঙ্কুকে ডাকল, চা দিয়ে যেতে বলল এক কাপ।

ত্রিদিব অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "তোর বেশি রকম বাড়াবাড়ি আছে, কান্তি। আমি যা শুনলাম, তাতে মনে হল খুবই বাড়াবাড়ি অবস্থা। এ সময় তুই..."

"বাবার হার্ট অ্যাটাক আগেও হয়েছে," কান্তি বলল।।

"হয়েছে তো কি হয়েছে, পালে বাঘ একবারই পড়ে, কখন পড়বে কেউ জানে না। আমার বাবা থার্ড টাইমে মারা গেল। আমরা ভেবেছিলাম—ধাক্কাটা বাবা সামলে যাবে, অ্যাটাক তেমন জোরও হয় নি..."

কান্তি ফট্ করে বলল, "সব বাপ তোর বাপ নয়; এ হল আমার বাপ—শচীন মজুমদারের হার্ট।"

ত্রিদিব রেগে গেল। চোখ মুখ লাল করে বলল, "কান্তি, আমি তোকে স্ট্রেট বলছি, এসব সময় চ্যাঙড়ামি আমার ভাল লাগে না। তুই যাবি, আলবাত যাবি, যদি না যাস, তবে শালা আমার সঙ্গে তোর রিলেশন থাকবে না।"

কান্তি কিছু বলল না। ত্রিদিবকে সাদামাটাভাবে দেখল। ত্রিদিব বরাবরই পিতৃভক্ত ছেলে। বাপ মারা গেলে বিরাট করে শ্রাদ্ধ করেছিল, কলকাতা পার্টির কীর্তন বসিয়েছিল।

বঙ্কু চা দিয়ে গেল।

"নে, চা খা—" কান্তি বলল।

চা খেতে খেতে ত্রিদিব বলল, "তুই শালা আহাম্মুক। বাপকে অনেক জ্বালিয়েছিস, চটিয়েছিস, এমন কর্ম করেছিস যার কোনো প্রিসিডেন্ট নেই।... তবু এখন তোর যাওয়া দরকার। আফটার অল তোর বাবা। তুই বুঝতে পারছিস না, শচীন মজুমদারের বাড়ি ঘর দোর সম্পত্তি সব যদি গলে যায় তোর ফিউচার কী হবে?"

কান্তি সবই বোঝে। সে বেশ বুঝতে পারছিল ত্রিদিব কোন তাড়ায় ছুটে এসেছে। শচীন মজুমদারের হার্ট অ্যাটাক বড় কথা নয়, বড় কথা, এ সময় কান্তি তার বাবার কাছে অন্তত দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত শেষ সর্বনাশটা হবে না। বিরক্ত লাগছিল কান্তির, ঘেন্না হচ্ছিল। মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধাও যেন ছিপে বাঁধা বঁড়শি, জায়গা মতন ফেলে রাখলে টোপ ধরে যায়। ত্রিদিব অনেকবার বলেছে, তোর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা-ফাকা নিয়ে আয় কান্তি, গ্যারেজটাকে বড়

করে ফেলি, তুই এ-দিকটা দেখবি, আমি অফিস টাকাপত্র আদায়। পার্টনারশিপ তোতে আমাতে। কথাটা ঠাট্টা করে বলা, নিতান্তই কথার কথা, নাকি ত্রিদিবের কোনো চাপা মতলব ছিল কান্তি জানে না। শচীন মজুমদার হার্ট অ্যাটাকে মরে যেতে পারে এই ভয় ত্রিদিবের মাথায় ঢুকেছে অকারণে নাকি? না, বন্ধুকে বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করল না কান্তি, শুধু ত্রিদিবের পরামর্শ তার পছন্দ হল না।

ত্রিদিব চা খেয়ে চলে গেল। বলল, "আমি বউকে নিয়ে ওর মামার কোলিয়ারিতে যাব একবার। ফিরতে যদি রাত না হয় মেসোমশাইকে দেখতে যাব। তুই আর দেরি করিস না। বাড়ি যা একবার।"

ত্রিদিব চলে যাবার পর কান্তি আবার চা খেল, সিগারেট খেল পর পর। বিকেল ফুরোলো, দোতলার বারান্দায় বসে বসে কান্তি নবমী পুজোর ভিড় জমে উঠতে দেখল বাজারে, রিকশা যাচ্ছে গায়ে গায়ে, ট্যাক্সি গাড়িটাড়ি ক্রমশই যেন মানুষের ভিড়ে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল, বাতি জ্বলে উঠল রাস্তায়, বাজার ভরতি আলো, হরেক রকম আলো ঠিকরে পড়ছে, দল বেঁধে বাচ্চাকাচ্চা চলেছে, বউ ঝি, ধুলো যেন ধোঁয়ার মতন চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যে হয়ে যাবার পর কান্তি নীচে নেমে টিউবওয়েলের জলে স্নান করে এল। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না দিন দুই। তবু এখন মাথাটা এমন গরম লাগছিল যে স্নান না করে উপায় নেই। প্যান্ট জামা পালটে চটিটা পায়ে গলিয়ে কান্তি বেরিয়ে পড়ল। শচীন মজুমদারকে সে দেখতে যাচ্ছে কিনা বোঝা মুশকিল, সে নিজেও খুব নিঃসন্দেহ নয়।

অকারণ, উদ্দেশ্যহীনভাবে কান্তি অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। এই মানুষজন, অট্টরোল, বেলুন বাঁশির শব্দ, পটকার আওয়াজ—কোনো কিছুই তার ভাল লাগছে না। একবার কান্তি ভাবল, 'নিউ বারে' চলে যায়, সেখানে বরেন থাকতে পারে; বরেন পুজোগন্ডার দিন শাক্ত মতে চলে। অথচ শেষ পর্যন্ত কান্তি গেল না। পরে ভাবল, মিলির কাছে চলে যায়। মিলির ডিউটি শেষ হয়েছে, এতক্ষণে তার ফেরার কথা। কান্তি মিলির কাছেও গেল না। মিলি আজকাল ঝামেলায় পড়েছে। তার নামে হাসপাতালে উড়ো খবর গেছে অনেক রকম। মিলি এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করছে।

কান্তি নেবুতলার মোড়ে একটা ফাঁকা রিকশা পেয়ে গেল। পেয়ে উঠে বসল। বলল, 'মহুয়াবাগান চল্।'

সামান্য রাত করে কান্তি মহুয়াবাগানে পৌঁছল। তখন কেমন এক ঘূর্ণি উঠেছে, ধুলো উড়ছিল। পুজোর আসর ভেতরের দিকে, বাচ্চাদের পার্কের মধ্যে। আলোর সাজ নজরে পড়ছিল। আকাশ পরিষ্কার, চাঁদ চেয়ে আছে। পুজোর আসরে কীর্তন শুরু হবার মুখে, খোলের শব্দ আসছিল ভেসে।

বাড়ির সামনে কান্তি গাড়িফাড়ি দেখল না। ফটক বন্ধ। বাইরের দিকে

বাতি জ্বলছে একটা। বাবার ঘরে আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, জানলা বন্ধ কিনা বুঝতে পারল না কান্তি। শচীন মজুমদার নিশ্চয় মারা যায় নি; মারা গেলে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যেত; বাড়ির ভেতরে আর সামনে কত গাড়িটাড়ি এসে দাঁড়াত, লোক জুটে যেত। না, মানুষটা বেঁচে আছে।

ফটক খুলে কান্তি বাড়ির সীমানায় ঢুকল। ঝপ্ করে মরে যাবার মানুষ বাবা নয়। হার্ট অ্যাটাক সামলে নেবার মতন ক্ষমতা বাবার আছে; মানে শচীন মজুমদার সেটা পারে; আগে একবার সামলেছে, তা ছাড়া বাবা তার চেয়েও বেশী মারাত্মক বিপদ সামলে নিয়েছে। কান্তি ভাবতেও পারে নি শচীন মজুমদারের জান কত শক্ত।

কান্তি বাগান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দোতলার দিকে তাকাচ্ছিল। একেবারে সাড়া শব্দহীন, অসাড়, আলো প্রায় নেই কোথাও, থমথম করছে। শিউলিফুলের গন্ধ এল বাতাসে। বাবা এখন কী অবস্থায় আছে কান্তি অনুমান করার চেষ্টা করছিল। বিছানায় অসাড় হয়ে শুয়ে আছে? ডাক্তার-টাক্তার আছে নাকি? রানী মাথার কাছে বসে আছে? বাবার ঘরে এখনও কি মরা-বাঁচার লড়াই চলছে?

গোল বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে কান্তি উঠল। হলঘরের দরজা বন্ধ। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। কারও গলা শোনা যাচ্ছে না, একেবারে নিঃসাড় বাড়ি। কলিংবেলের বোতামে হাত দিতে কেমন আড়ষ্ট লাগছিল, ভয় হচ্ছিল। সামান্য সময় কান্তি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, যেন নিজেকে স্থির শান্ত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। মাথার চুলগুলো গুছিয়ে নিল আঙুলে। তারপর বোতাম টিপল। এমন ভঙ্গি করে দাঁড়াল যেন তার উত্তেজনা নেই, উদ্বেগ নেই। স্বাভাবিকভাবে সে এসেছে।

দরজা খুলল। নন্দ। কান্তিকে দেখে বিহ্বল। তার চোখমুখ শুকনো, উদ্বেগভরা, ব্যাকুল।

কান্তি হলঘরের মধ্যে এল। "বাবা কেমন আছে?" কান্তির গলার স্বর ভাঙা, অস্পষ্ট শোনাল।

নন্দ যেন নিজের বিহ্বলতা কাটাতে পারছিল না। কান্তি নন্দকে দেখছিল না।

চাপা কান্নার গলায় নন্দ বলল, "বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।"

"হাসপাতালে? কখন?"

"বিকেল বেলা।"

কান্তি কি যেন ভাবল। "ত্রিদিব আমায় বলল..."

"ত্রিদিববাবুকে আমি বলে এসেছিলাম," নন্দ বলল, "তারপর হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

"কেমন আছে?"

"নল দিচ্ছে।"

অক্সিজেন। বাবাকে এখন হাসপাতালে অক্সিজেন দিচ্ছে।

"কী বলছে ডাক্তাররা?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"সকাল থেকে ভাল।"

"ও!"

কান্তি হলঘর দিয়ে সামনের দিকে দু এক পা এগিয়ে গেল।

"তুমি একবার হাসপাতালে যাও না, দেখে এসো," নন্দ বলল।

"এখন বোধ হয় ঢুকতে দেবে না।"

কান্তি হলঘর দিয়ে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। সমস্ত বাড়িটা নিঃঝুম, বাতিগুলোও জ্বালানো হয় নি সব, দু একটা জ্বলছে, তাও অনুজ্জ্বল। সিঁড়ির ধাপগুলো অস্পষ্ট। একতলার ডানপাশটা অন্ধকার। দোতলার সিঁড়ির মুখের হালকা বাতি থেকে অস্পষ্ট আলো আসছে।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল কান্তি, তার পা ভারী লাগছিল, কেমন যেন ঠাণ্ডা ভাব, ওষুধপত্রের একটা গন্ধ বাতাসে। বাড়িটা এত বেশী নীরব যে মনে হয় এখানে কেউ নেই, ফাঁকা পড়ে আছে ঘরদোর। মা মারা যাবার পর কান্তি একদিন আচমকা ভয় পেয়েছিল মার ফাঁকা ঘরে ঢুকে। এখন কান্তি ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

দোতলায় উঠে এল কান্তি। চওড়া বারান্দার একপাশে বাতি। বাকি কোথাও আলো নেই। রানীর ঘরেও আলো জ্বলছে না। কান্তি আস্তে আস্তে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কান্তি; তারপর দরজাটা দু হাতের ধাক্কায় আচমকা খুলে দিতেই ঘরের অন্ধকার, শূন্যতা, ওষুধের গন্ধ যেন অলৌকিক এক ভীতি ও ত্রাস নিয়ে তার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সরে এল কান্তি। বাবার ঘরের দিকে তাকানো তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। তাড়াতাড়ি পিঠ ঘুরিয়ে কান্তি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখন—ওই মুহূর্তে কান্তির মনে পড়ল, আর-একদিন কান্তি বাবার ঘরের বাইরে এসে এইভাবে—না আরও বেশী ভীত, আতঙ্কিত, ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালিয়েছিল। সেদিন বাবার ঘরে যা ঘটেছিল সবই ভয়ংকর, বীভৎস; আজ শুধু ভয়, অদ্ভুত এক ভয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কান্তি গাড়ির শব্দ পেল। বাড়ির গাড়ি। চেনা হর্ন। তাড়াতাড়ি কান্তি সিঁড়ি নামতে লাগল। কে এল?

হলঘর দিয়ে বেরিয়ে আসার মুখেই কান্তি দেখল, রানী। পাড়অলা সাদা-জমির শাড়ি, সাদা জামা। মাথার কাপড় নেই। সামান্য অগোছাল ভাব।

রানী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কান্তির মুখোমুখি। দুজনে দুজনকে দেখছিল। রানী প্রথমটায় অবাক হলেও পরে তার চোখেমুখে বিরক্তি, ঘৃণা, বিদ্বেষ কালো হয়ে আসছিল।

রানীই কথা বলল প্রথমে। "তুমি এখানে?"

রানীর বলার ধরনে এমন একটা উদ্ধত এবং অবজ্ঞার ভাব ছিল যে, কান্তির

প্রথমেই ইচ্ছে হল, রানীর গালে জোরে একটা চড় মারে। রাগ হচ্ছিল কান্তির, অসহ্য রাগ। কান্তি নিষ্ঠুর চোখে রানীকে দেখতে দেখতে বলল, "কোথায় গিয়েছিলে? হাসপাতালে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন আছে—?"

"কিছু বলা যাচ্ছে না।"

"বাঁচবে?"

রানী পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে যেন পথ দেখছিল। কান্তির দিকে তাকাল না। বলল, "মরাবাঁচা ভগবানের হাত।"

রানী ভাবছিল চলে যাবে। কান্তি পথ আটকে থাকল। "ডাক্তার কী বলছে?"

"বলছে, একটু ভাল!"

কান্তি পথ ছেড়ে দিল। রানী পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল। কান্তি ফিরে তাকাল।

হলঘরে কেউ নেই। শেড্ ঢাকা হালকা বাতি জ্বলছে। বিরাট হলঘরের অনেকটাই কেমন ঝাপসা অন্ধকার।

রানী দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বলল, "তুমি এ বাড়িতে আবার কেন এসেছ?"

কান্তি পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল। "তোমার বাড়ি?"

"বাড়ি আমার না কার সেটা পরে হবে। তুমি আসবে না," রানী উগ্র গলায় বলল।

"কেন?"

"আমি বলছি। কেন, কি জন্যে সে-কথা তোমায় বলার দরকার আমার নেই। অনেক বয়েস হয়েছে তোমার, নিজেরই বোঝা উচিত।"

কান্তির মাথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে গেল। 'তুমি আমায় বোঝাতে এসেছ? আমি তোমার কাছে এসেছি?"

রানী ধমকে উঠে তীক্ষ্ম গলায় বলল, "চেঁচিয়ো না, বাড়িতে চাকরবাকর আছে; তোমার চেঁচানি শুনলে সবাই ছুটে আসবে।"

"আসুক।... এই চাকরবাকররা তোমায় দেখছে না?"

"কী দেখছে আমায়!" রানীর চোখমুখ লাল।

"যা দেখার, তুমি যা দেখাচ্ছ..."

রানী আর সহ্য করল না। আঙুলে তুলে দরজা দেখিয়ে দিল। "তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। অসভ্য, ছোটলোক, চামার। তোমার সামনে মানুষ দাঁড়াতে পারে না। যাও তুমি।"

কান্তি গেল না, বরং রানীর দিকে দু পা এগিয়ে এল। ভীষণ হিংস্র, নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল তাকে। "তুমি ভদ্রলোক? তুমি নিজেকে ভদ্রলোক মনে কর?"

রানী কান্তির চোখমুখের ভাব দেখে ভয় পেল। বিশ্বাস নেই ওকে। সব কিছুই করতে পারে। রানী বলল, "তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করার

সময় আমার নেই। সারাটা দিন আমার কী করে কেটেছে আমিই জানি। হাসপাতাল থেকে সবে ফিরলাম।" বলে রানী চলে যাচ্ছিল।

কান্তি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে রানীর আঁচল ধরে ফেলল। ফেলে টানল। রানীকে ঘুরে দাঁড়াতে হল। শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে খসে গেছে।

কান্তি বলল, "সারাদিন তুমি কপাল ঠুকেছ নাকি?" বলে বিশ্রী রকম হাসির মুখ করল কান্তি, নোংরা, কুৎসিত ধরনের হাসি।

রানীর ধৈর্য ছিল না, কান্তির মুঠোয় তখনও তার আঁচলের খানিকটা ধরা আছে। দাঁতে দাঁত পিষে রানী বলল, "হ্যাঁ, কপাল ঠুকেছি। জানোয়ার কোথাকার—!" বলে হেঁচকা টান দিল রানী শাড়িতে। "ছেড়ে দাও কাপড়, ইতর, অসভ্য, ভদ্রতা জান না!"

"তোমার কপাল ঠোকবার কি হয়েছে? শচীন মজুমদার মারা গেলে তোমার কী? তুমি তার বউ?" কান্তি নোংরা করে বলল।

রানী এমন করে তাকাল যেন সাধ্য থাকলে কান্তিকে সে দু হাতে ঠেলে ঘরের বাইরে তাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। না পারার ক্ষোভে, অপমানে তার চোখ ধকধক করছিল।

"আমি কী তোমার জানার দরকার নেই"—রানী কঠিন গলায় বলল।

কান্তি কান দিল না। "তুমি ভাবছ শচীন মজুমদার মারা গেলে, ঝপ করে মরে গেলে তুমি পথে বসবে। এ্যাঁ—! তাই কপাল ঠুকছ! এতদিন ধরে কি করলে তাহলে? এত গীতা ভাগবত শোনালে? সেবাযত্ন করলে? গা টিপলে? শচীন মজুমদারের কানে মন্ত্র দিলে? কি করলে শালা এতদিন?"

রানী শাড়ির আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ে টেনে নিল। বলল, "আমার যা করার আমি করেছি। জানতে পারবে। তোমার বাবা যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন চুপ করে থাক, তারপর জানতেই পারবে।"

কান্তি হঠাৎ বিশ্রীভাবে তার গা দুলিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, "জা-ন-তে পারবে! কী বাকি রেখেছ জানার? তোমার গতর তোমায় জানিয়ে দেয়। শালা তুমি কি করে শচীন মজুমদারকে তুষ্ট করছ, আমি জানি না?"

"ছোটলোক," রানী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "নোংরা, বজ্জাত, ইতর কোথাকার!"

"তুমি শালা মাগী, খচড়ি...তুমি একটা কুত্তা..."

রানীর সমস্ত মুখে আগুন জ্বলছিল, আচমকা চিৎকার করে রানী বলল, "তুমি বেরিয়ে যাও, চলে যাও আমার বাড়ি থেকে, আমি তোমায় চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দেব। জন্তু, বদমাশ, শয়তান—"

"এই শালা—" কান্তি হাত তুলে প্রচণ্ড জোরে থাপ্পড় মারতে এসেছিল, তার আগেই রানী সরে গিয়েছে মুখ বাঁচিয়ে।

রানী ভীষণভাবে চেঁচাতে লাগল। হলঘরের দিকে চাকরবাকররা ছুটে আসছে।

কান্তি বলল, "এই বাড়ি থেকে তুমি আমায় তাড়াবে! তুমি কে? মালিক?"

"হ্যাঁ, আমি মালিক।"

"তুমি শচীন মজুমদারের মেয়েছেলে।"

"আমি তার বউ।"

কান্তি একেবারে পাগল হয়ে গেল যেন। "খবরদার শালা, জিব সামলে কথা বলো, আর একবার বলেছ কি তোমায় আমি মেরে ফেলব।"

ঝি চাকররা অনেকেই হলঘরে চলে এসেছে ততক্ষণে। কান্তি দেখল। তার বাবার চাকর সব, তার মার আমলের চাকর, তারও চাকর ছিল। আজ সব রানীর গোলাম হয়ে গেছে।

রানী ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে ঝি চাকরদের বলছিল, "কে ওকে এই বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে? কে দিয়েছে? কার হুকুমে ঢুকেছে ও? তাড়িয়ে দাও ওকে। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। কোনোদিন এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না ওকে..."

কান্তি নন্দকেও দেখতে পেল। মুখ ফ্যাকাশে, চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁতে দাঁতে চেপে কান্তি অস্ফুট করে বলল, "শালা খানকি...।" আর দাঁড়াল না, হলঘরের বাইরে চলে এল। তারপর খেপার মতন বাগানে নেমে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "তোমাকে আমি দেখে নেব। তুমি কত বড় মেয়েছেলে আমি দেখব। আমি শালা কিছু কেয়ার করি না। আমার কোনো ভয় ভাবনা নেই। আমি দেখব, তুমি শালী কত বড় শয়তান।" বাগান দিয়ে ছুটতে ছুটতে কান্তি ফটকের সামনে এল, ফটক খুলে দৌড়তে লাগল যেন কোনো কিছুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

অপেক্ষা করে করে মিলির মনে হল, কান্তি আর আসবে না। অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল, সোয়া দশ। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে মিলি অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। যে মানুষটা রোজ সময় মতন চলে আসে আজ তার না আসার কোনো কারণ মিলি খুঁজে পাচ্ছিল না। পুজোর দিন হলেও এতটা রাত কান্তি করবে না, তার ফিরে আসার অন্য টানও আছে। সাড়ে দশটা বেজে যাবার পর মিলি আর অপেক্ষা করল না; সদরটা বন্ধ করে আসার জন্যে উঠে পড়ল।

সিঁড়ি অন্ধকার। অভ্যাসবশে মিলি নেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকারে কেমন একটা ভারী জিনিসের গায়ে পড়ে সে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল সিঁড়ির ওপর। পড়তে পড়তে কোনোরকমে সামলে নিলেও তার কনুই আর গোড়ালিতে লাগল। থতমত খেয়ে অন্ধকারে তাকাতেই ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল মিলি। সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হল, অন্ধকারে সিঁড়ির ওপর হাঁটু ভেঙে মুখ গুঁজে কান্তি যেন বসে আছে।

রাগের মাথায় কি যেন করতে যাচ্ছিল মিলি, হয়ত দু হাতে জোরে ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল কান্তিকে, হয়ত চুলের গোছা ধরে টানত, আঁচড়ে খামচে কিছু একটা করত, ভারী গন্ধ নাকে আসতেই মিলি বুঝল, কান্তি রীতিমত মাতাল হয়ে সিঁড়ির মধ্যে অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে।

সদর বন্ধ করে দিল মিলি। ফেরার মুখে সে বুঝতে পারল না, ওই মাতাল-টাকে কিভাবে ওপরে নিয়ে যাবে? রিকশা করে কান্তি যখন বাড়িই ফিরতে পারল, তখন রিকশাঅলাকে ধরেটরে সিঁড়িটুকু উঠে গেলেই পারত। এই উৎপাত, জ্বালাতন মিলির আর সহ্য হয় না। সিঁড়িটাও অন্ধকার। ঘুটঘুটে। কিছু দেখা যায় না। সদর বন্ধ করার পর আরও ঘুটঘুট করছে। আশ্চর্য লোক! মদে চুর হয়ে এসে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে! বদমাশ, হতচ্ছাড়া একেবারে।

মিলি আন্দাজে দু ধাপ সিঁড়ি উঠে তিরিক্ষে গলায় বলল, "আমার এখানে না এসে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারলে না? যত শয়তানি আমার সঙ্গে?"

কান্তি কোনো জবাব দিল না।

জবাব না পেয়ে মিলি আরও চটে গেল। "কী হল, মরে গেছ?"

কান্তির মুখে কথা নেই।

মিলি আরও একটা ধাপ উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারে কান্তির গায়ে ঠেলা দিতে গিয়ে মাথার ওপর হাত পড়ে গেল। কান্তি মুখ গুঁজে বসে আছে। "উঠবে তো ওঠো, না হলে সিঁড়িতেই বসে থাক, আমি ঘরে চলে যাচ্ছি। তোমার জন্যে সারারাত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।"

কান্তি মাথা তুলল। কেমন শব্দ করল, যেন হুঁশ ফিরে পেয়ে কিছু বলতে চাইল।

মিলি ততক্ষণে হাতড়ে হাতড়ে হাতটা ধরতে পেরেছে কান্তির। "ওঠো, আর জ্বালিয়ো না আমায়।"

কান্তি সিঁড়ির মধ্যে পা ছড়াল, একটা হাত নাড়ল, সিঁড়িতে হাতের ভর দেবার চেষ্টা করছিল।

মিলি ভেবেছিল মাতালটা আর উঠতে পারবে না, না পারলে মিলির পক্ষে টেনে তোলা, হেঁচড়ে হেঁচড়ে ওপরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অন্ধকারে আরও নাজেহাল হয়ে পড়বে। বাতি-টাতি থাকলে তবু দেখা যেত। মোমবাতি জ্বালিয়ে এনে সিঁড়িতে রাখাও খুব যে কাজের হবে তাও মনে হয় না।

কান্তি বার কয়েক চেষ্টা করে টাল খেতে খেতে কোনো রকম উঠে দাঁড়াল। মিলি নীচের সিঁড়িতে থাকল না, কান্তি যদি তার গায়ে পড়ে সে সামলাতে পারবে না। ওপর সিঁড়িতে উঠে মিলি কান্তির হাত শক্ত করে ধরল, সে দুর্বল নয়, অন্তত স্বাভাবিক ঝোঁক সামলাবার ক্ষমতা তার আছে।

কান্তি হেলে পড়ছিল, টাল খাচ্ছিল, এক হাতে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়াল ধরছিল, অন্য হাতে মিলির ওপর ভর রাখছিল। কষ্টই হচ্ছিল মিলির। শেষ পর্যন্ত কান্তিকে ঘরে এনে ঢোকাতে পারল।

আলোয় কান্তিকে স্পষ্ট দেখা গেল। গায়ের জামা প্রায় খোলা। প্যান্টেরও বোতাম টোতাম আঁটা নেই সবগুলোর, খালি পা, মুখ লালচে, ফোলা ফোলা, চোখের পাতা জড়িয়ে আছে, মাথার চুল এলোমেলো।

মিলির গা জ্বলে যাচ্ছিল। এই বেহুঁশ লোকটাকে কেমন করে প্যান্ট জামা পরাবে, কলঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে পা ধুইয়ে আনবে সে বুঝতে পারছিল না। যা অবস্থা কান্তির তাতে ওকে এখন বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতেও ঘেন্না করছিল।

কঠিন গলায় মিলি বলল, "মদ গিলতে বসলে যার জ্ঞান থাকে না সে রাস্তায় গড়াগড়ি দিলেই পারে, আমার এখানে আসে কেন? এমন নচ্ছার আমি দেখি নি।...জামা খোল, প্যান্ট ছাড়, গিয়ে হাত পা ধুয়ে এস। আমি তোমার ভাত-খাওয়া দাসী নয়। পা ধোবার জল এনে দিতে পারব না।"

কান্তির সামান্য হুঁশ হচ্ছিল। জামাটা খোলার চেষ্টা করল। পারল না। মিলি পাশে দাঁড়িয়ে। টলছিল কান্তি।

জামাটা খুলে দেবার জন্যে মিলি গায়ের কাছে আসতেই কান্তি তাকে ধরে ফেলল। নিজেকে সামলে নিল মিলি; কোনো রকমে কান্তিকে ক্যাম্বিসের চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল। যেন ফেলেই দিল।

চেয়ারে একেবারে এলিয়ে শুয়ে পড়ল কান্তি।

মিলি ভাবছিল, চেয়ারেই যদি শুয়ে থাকতে চায় কান্তি শুয়ে থাকুক, সে আর টানাটানি করতে পারবে না।

কান্তি হাত উঠিয়ে খাবার জল চাইল।

জল এনে দিল মিলি। "পিরিত করে এত মদ খাওয়ালে কে?" বিতৃষ্ণার সঙ্গে মিলি বলল।

কোনো জবাব দিল না কান্তি, গা হাত পা এলিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

মিলি দেখল, অকারণ এই চেষ্টা। কান্তির কোনো রকম হুঁশ নেই। থাক, চেয়ারে শুয়ে থাক। দরজা বন্ধ করল মিলি। বাতি নিবিয়ে দিল। শুয়ে পড়ল। তাকাল। কোনো সাড়াশব্দ নেই কান্তির। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, চেহারা শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে পায়ে জামায় প্যান্টে নোংরা নিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে, নেশার ঘোরে তার কোনো কিছু খেয়াল নেই।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মিলি অনেকবার চেয়ারের দিকে তাকাল। কোনো সাড়াশব্দ নেই কান্তির। দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে, চেহারা ধরা যাচ্ছে না, গাঢ় ছায়ার মতন কিছু যেন পড়ে আছে চেয়ারের ওপর। মিলি অস্থির হয়ে এ-পাশ ও-পাশ করল, চোখ বুজল, আবার চোখ খুলে তাকাল, কান্তির দিকে চেয়ে থাকল। আশ্চর্য, লোকটা যে বেঁচে আছে তার কোনো লক্ষণ নেই। নড়াচড়ার বিন্দুমাত্র শব্দ হচ্ছে না।

মিলি আবার উঠল। বাতি জ্বালল। কান্তি অদ্ভুত মুখ করে ঘুমিয়ে আছে : তার মাথা এক দিকে হেলানো, মুখটা ঝুঁকে বুকের দিকে গড়িয়ে গেছে,

হাত দুটো দু পাশে ঝোলানো—মেঝে ছুঁয়ে গেছে, পা ভাঁজ করা। মরা মানুষের মতন দেখাচ্ছিল কান্তিকে।

জল এনে কান্তির চোখে মুখে ঝাপটা দিল মিলি, ঘাড়ের কাছটা ভিজিয়ে দিল। তাকাল কান্তি। অস্পষ্ট দৃষ্টি। জামাটা গা থেকে কোনো রকমে খুলে নিল মিলি। তারপর প্রাণপণে টানল। "ওঠো, বিছানায় চলো।"

কান্তি কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। মিলি নিজের ওপর কান্তির শরীরের ভর নিয়ে টেনে টেনে বিছানায় এনে বসাল কান্তিকে। প্যান্টের কোমর খুলল। বোতাম সব কটা খুলে দিল। কান্তি ততক্ষণে বিছানায় হেলে পড়েছে।

টেনে হেঁচড়ে প্যান্টটা খুলে লাথি দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল মিলি। কান্তির পা ঠেলে দিল বিছানায়। বাতি নিবিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গালাগাল দিয়ে বলল, "আর ক'টা দিন, তারপর দেখব কাকে তুমি জ্বালাও! হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার!"

আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়ে মিলি দেখল, ঘরে বাতি জ্বলছে, কান্তি বিছানায় নেই। বালিশে মাথা তুলে তাকাল মিলি; পাশের ঘরে আলো জ্বালানো, কান্তি কলঘরে গিয়েছে। মিলি আবার বালিশে মাথা রাখল।

কান্তি ফিরল। বোধ হয় পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। কাশির শব্দ পেল মিলি। ও ঘরের বাতি নিবল। শোবার ঘরে এল কান্তি। মিলি চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে থাকল, যেন ঘুমোচ্ছে। শুয়ে শুয়েই মিলি বুঝতে পারল কান্তি সিগারেট ধরাল। দাঁড়িয়ে থাকল জানলার কাছে দু মুহূর্ত, তারপর বাতি নিবিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

মিলি কোনো রকম সাড়া শব্দ না করে পাশ ফিরে গেল।

কান্তি আপন মনে কি যেন বলল, বিড়বিড় করে। মিলি বুঝতে পারল না। ভোরের কাক না মাঝরাতের ঘুম ভাঙা কাক ডাকল বোঝা গেল না।

মিলির দিকে পাশ ফিরে কান্তি ডাকল, "মিলি!"

মিলি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকল।।

কান্তি গা নেড়ে দিল মিলির। "মিলি? এই মিলি?"

সাড়া দিল মিলি।

"তুমি ঘুমোচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"না, তুমি জেগে আছ।"

মিলি কিছু বলল না। ইচ্ছে হল বলে, তুমিও কি আমায় জেগে থাকার চাকরি দিয়েছ?

কান্তি মিলির গায়ে হাত রাখল। "কাল বিকেলে বাবাকে তোমাদের হাস-পাতালে পাঠিয়েছে, জান?"

মিলির ঘুম আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কান্তির কথায় অবাক হল। কিছুই

বুঝতে পারল না। বলল, "না।"

"তুমি জান না?"

"না, কেমন করে জানব?"

"কাল সকালে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে; বিকেলে হাসপাতালে শিফট করেছে। তুমি কিছু শোনো নি?"

"না, মেডিকেল ওয়ার্ডের খবর আমরা পাই না।"

কান্তি চুপ। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে।

"কাল তুমি কোথায় ছিলে?" মিলি জিজ্ঞেস করল।

"কাল বিকেলে ত্রিদিব গিয়ে বলল, বাবার বাড়াবাড়ি অবস্থা। ও আমায় বাড়ি যাবার জন্যে খোঁচাতে লাগল।" কান্তি আস্তে আস্তে বলছিল, যেন ভেবে ভেবে বলছে, কথার মধ্যে দুর্বলতা, গলার স্বর ভাঙা শোনাচ্ছিল, কেমন যেন অবসাদ রয়েছে তার বলার ভঙ্গিতে। "আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না। তবু সন্ধ্যের পর একবার গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—বাবা নেই, হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে আগেই।" কান্তি থামল, নীরব থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর অসন্তুষ্ট গলায় বলল, "না গেলেই ভাল ছিল; গিয়ে ঝামেলা হয়ে গেল।"

"হাসপাতালে যাও নি?"

"না।"

"কেন?"

"কী হত গিয়ে! রাত হয়ে গিয়েছিল। আমায় ঢুকতে দিত কিনা কে জানে!...গিয়েই বা কী দেখব...! আমার মেজাজটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

মিলির কেমন আশ্চর্য লাগছিল। শচীন মজুমদারের জন্যে তার ছেলের এতটা মন ভেঙে যাওয়া যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। মিলি বলল, "মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বলে মদ খেতে গেলে?"

কান্তি প্রথমে কোনো জবাব দিল না। বালিশের ওপর মুখ চেপে শুয়ে থাকল। ঘরে এখনও একই রকম অন্ধকার; ঘুম ভাঙা ভোরের কাক ক্বচিৎ ডেকে উঠে আবার থেমে যাচ্ছে; সেই একই স্তব্ধতা, নিশ্চুপ, ঘুমন্ত চারপাশ।

কান্তি বলল, "শচীন মজুমদারের জন্যে আমার মেজাজ খারাপ হয় নি। বাবা বাঁচল কি মরল—আমার কিছু আসে যায় না। আমার কাছে কবেই বাবা মারা গেছে। কান্তি মজুমদারের কোনো দুঃখ নেই। বাবার জন্যে কেঁদে মরবার ছেলে আমি নই।...রানী আমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল।"

"রানী?"

"আমার কপালটা খারাপ। বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তখনই চলে এলে কোনো ঝামেলা হত না।...একটু থেকে গেলাম বাড়িতে, দশ বিশ মিনিট, আর একেবারে রানীর মুখোমুখি। হাসপাতাল থেকে ফিরছিল রানী।"

মিলির গা সিরসির করছিল। ভোরের ঠান্ডায় শীত শীত করে এখন।

আঁচলটা ছড়িয়ে নিল মিলি গায়ের ওপর।

কান্তি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে থাকল।

কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা হল না। শেষে কান্তি বলল, "রানী কাল আমাকে কুকুর বেড়ালের মতন তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।...অপমান য করেছে...কী বলব...।"

মিলি যেন এতক্ষণে কান্তির কালকের অবস্থাটা ধরতে পারছিল। রানী কী এত অপমান করল জানার কৌতূহল বোধ করলেও মিলি কিছু জিজ্ঞেস করল না। কান্তি নিজেই বলবে এই আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

কান্তি আর কিছু বলছিল না; বালিশে মুখ চেপে আগের মতনই উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল।

ভোর হয়ে আসছে। বাড়ির কাছাকাছি কাক ডাকছে, পাখি ওড়ার ফরফর শব্দ, রথতলার দিকে এই ভোরে কে যেন ঢাক বাজাতে শুরু করল, গলির ঘুমভাব কেটে উঠছে, সাড়াশব্দ কানে আসছিল। সকালের বাতাসে মিলি আরও কুঁকড়ে শুয়ে থাকল।

হঠাৎ কান্তি বলল, "রানী কাল খুব বেঁচে গিয়েছে; খু—ব। এমন সব কথা বলছিল যে আর একটু হলেই আমি তার গলা টিপে ধরতাম। আমার হাতেই মরত।...কে জানে, একদিন হয়ত ও আমার হাতেই খুন হবে।

মিলি সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "এই সাত সকালে তোমায় আর খুনো-খুনির কথা ভাবতে হবে না। শুয়ে থাক চুপ করে।"

কান্তি চুপ করে শুয়ে থাকল, কিন্তু খুনের কথা না ভেবে পারল না। কেমন একটা আপসোসের মতন তার মনে হচ্ছিল, রানীকে সে অনেক আগেই মেরে ফেলতে পারত। কিংবা রানীকে অক্ষম করে দেওয়া যেত। বোকার মতন সে শচীন মজুমদারকে কেন মারতে গিয়েছিল? রানী আরও সহজে খুন হতে পারত।

ঘটনাটা কান্তির চোখের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কান্তি চাইছিল না—ওটা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাকে সরানোও কান্তির সাধ্য হল না।

কোনো কিছুই কান্তি ভোলে নি; ভুলে যাবার কথা নয়। দিনের পর দিন ভূতের মতন ঘটনাটা তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। এখনও কখনো কখনো কান্তির গলা টিপে ধরতে আসে। কান্তি বুঝতে পারে না, সেই বোঝাটা কেন তার ঘাড়ে চেপে আছে এখনও? কেন?

স্পষ্টই মনে আছে কান্তির, সেদিন তার শরীরটা একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না। শীতের দরুন ঠান্ডা-ফান্ডা লাগতে পারে হয়ত। বিকেলে কান্তি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আড্ডাফাড্ডা মারতে। বরেনের সঙ্গে দেখা, বলল—চল্ একটু বড়দিন করে আসি। হ্যাঁ—তখন বড়দিন চলছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডা চলছে ক'দিন। কান্তি বেশী খায় নি, সামান্য, তাতে এমন কিছু নেশা হবার কথা নয়। শালা পারিজাতও এসে জুটল। কথায় কথায় পারিজাত বলল, তুই বাড়ি যা

—তোর জ্বরটর হয়েছে মনে হচ্ছে। তোকে সিক দেখাচ্ছে। বাড়ি চলে যা।... কান্তির নিজেরও ভাল লাগছিল না। সে সোজা বাড়ি চলে এল। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়বে ভাবছিল, হঠাৎ তার মনে হল, দোতলায় গিয়ে রামনারানকে একটা ফোন করতে হবে। জরুরী। জামাটামা না খুলেই কান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দোতলায় বাবার বসার ঘরে ফোন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল কান্তি, যখন সে প্রায় শেষ সিঁড়িতে, দেখল রানী বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। রানী কী মেখেছিল কে জানে, গাঢ় একটা গন্ধে বারান্দার বাতাস ভরে গেল। রানীর মাথায় আজ খোঁপা নেই, এলো চুল, পিঠের ওপর কালো রঙের শাল। রানী এমনভাবে গেল, মনে হল, যেন সে কোনো মজার ঘটনা ঘটানোর জন্যে হাসতে হাসতে বাবার ঘরে চলে গেল। কান্তি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল একটু। বারান্দার দিকের রেলিং ঘেঁষে মোটা কাচের পাল্লাগুলো আটকানো, শীতের জন্যে। এক পাশে হালকা বাতি জ্বলছে, বারান্দাটা তেমন স্পষ্ট করে দেখা যায় না। দোতলায় সন্ধ্যের দিকে কেউ বড় আসে না; চাকরবাকরদের না ডাকলে তাদেরও যাওয়া নিষেধ। বাবা এ সময় নিজের ঘরে বিশ্রাম করে, আরাম করে, মাপ মতন নেশাটেশা করে, রানী বাবার কাছে থাকে।

ফিরে আসবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত কান্তি ফিরতে পারল না। প্রায় নিঃশব্দে সে বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রানীর রেখে যাওয়া তীব্র গন্ধ, এলো চুল, কালো শাল যেন তাকে টানছিল। বাবার ঘরের কাছাকাছি এসে কান্তি দেখল, মোটা পরদাটা দরজার ওপর ঝুলছে, দরজার পাল্লাও যেন পুরোপুরি খোলা নয়।

কান্তির পা কাঁপছিল, মাথা দপদপ করছিল, বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড লাফিয়ে উঠছিল। হাত বাড়াতে গিয়েও কান্তি হাত টেনে নিল। আবার বাড়াল।

ঘরের মধ্যে বাবা তার সেই রাজসিংহাসনে বসে আছে, হাতে চুরুট, ডান পাশে বাবার নেশার জিনিস সাজানো। ফরসা, লম্বা চেহারা বাবার, চোখে চশমা, পরনে ধুতি, গায়ে পশমের গেঞ্জির ওপর সাদা শাল। রানীকে দেখা যাচ্ছিল না। কোথায় রানী? বাবার পাশে নেই, বিছানায় নেই। আচমকা হাসি শুনে কান্তি বাবার বিশাল আয়নার দিকে তাকাল। বাবার ঘরের বাথরুমের দরজা খোলা। ঘরের সব জানলা বন্ধ। বাথরুমের দিক থেকে রানীর গলার হাসি আসছে। আয়নায় বাথরুমের খোলা দরজায় ছায়া। ঘরের বাতি মোলায়েম। কান্তি রানীর গোল ফরসা হাত, পা, কোমর, পেছন দেখতে পাচ্ছিল।

রানী কী করছিল কান্তি বুঝতে পারছিল না। কেননা রানীকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল না। বাবার দিকে তাকাল কান্তি। শচীন মজুমদারের চোখ মুখ নোংরা দেখাচ্ছিল।

রানী হেসে উঠে বলল, "আমার শীত করছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

শচীন মজুমদার কিছু বলল। কান্তির কানে কথা গেল না। আর দাঁড়াতে

পারল না কান্তি। সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তারপর তরতর করে সিঁড়ি নেমে নিজের ঘরে। হাতের কাছে কান্তি কিছু খুঁজে পেল না। বাবার বন্দুক বাবার ঘরে। ঘরের মধ্যে বেহুঁশ খেপার মতন দাঁড়িয়ে কান্তি যেন কিছু একটা খুঁজল। না পেয়ে নিজের ঘর থেকে দৌড়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাছাকাছি কিছু নেই, বড় মিটশেফের ওপর রুটি কাটা ছুরিটা পড়ে ছিল। ছুরিটা তুলে নিয়ে কান্তি দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল। লাফ মেরে মেরে সিঁড়ি উঠছিল কান্তি, একেবারে খেপা উন্মাদ হয়ে গেছে। বাবার ঘরের কাছে পৌঁছতে দেখল, দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শচীন মজুমদার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল। তা আগেই কান্তি বাঁ হাতে পরদাটা ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। মোটা পরদায় শচীন মজুমদারের মুখ কাঁধ জড়িয়ে গিয়েছিল। কান্তি কোনো দিকে তাকাল না, খেয়াল করল না, সোজা ছুরিটা পিশাচের মতন সামনে চালিয়ে দিল।

তারপর কী হল কান্তির খেয়াল নেই। শচীন মজুমদারের আর্তনাদ, রানীর বাড়ি কাঁপানো চিৎকার, মোটা পরদা জড়িয়ে শচীন মজুমদার পড়ে গেল না কি হল কান্তি দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল না। সে পালাতে লাগল, বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে হল ঘর, তারপর বাগান। বাড়ি ছেড়ে পালল কান্তি।

কান্তি ভেবেছিল, সে পুলিসে পড়বে। খুনের মামলার আসামী হবে। ফাঁসিটাসি হয়ে যেতে পারে তার। আশ্চর্য, তার কিছু হল না। শচীন মজুমদারকে ডাক্তার হাসপাতাল করতে হল; কিন্তু ছেলেকে বাঁচিয়ে দিল। আসলে ছেলের জন্যে বাবা গলে যায় নি। নিজের কেচ্ছা, বাড়ির কেলেঙ্কারি, রানী আর শচীনের স্ক্যান্ডাল যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্যে বাবা পুলিস এবং ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে কান্তিকে বাঁচিয়ে দিল। অবশ্য ছুরির ঘা বাবার ডান হাতের বাহুর তলায় লেগেছিল। বেশ জোরেই লেগেছিল। অনেক দিন ডাক্তার-টাক্তার করতে হয়েছে। ডান হাতটাও তখন থেকে পঙ্গু। জোর নেই তেমন।

এই ঘটনার পর কান্তি বাড়িছাড়া। অনেক পরে সে বার দুই-তিন বাড়ি গিয়েছিল। তাকে যেতে হয়েছিল দায়ে পড়ে। সামান্য সময়ের জন্যে।

কান্তি যদিও থানা পুলিস আদালতের হাত থেকে বেঁচে গেল, তবু সারা শহর জেনে গেল কান্তি তার বাবাকে খুন করতে গিয়েছিল। লোকে তাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল, ঘেন্না করতে লাগল, দূরে ঠেলে দিতে লাগল, বন্ধু-বান্ধবরাও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কান্তি শহরে আর দু-দশজন পাক্কা ক্রিমিন্যালের চেয়েও বড় ক্রিমিন্যাল হয়ে গেল। নিজের বাপকে, শচীন মজুমদারের মতন বাপকে যে খুন করতে যায়—সে যে কী সাংঘাতিক এ যেন শহরের লোক ভাবতে না পেরে স্তম্ভিত হয়ে কান্তিকে দেখতে লাগল।

কান্তি বেশ বুঝতে পারল, সমাজ তাকে শুধু দেখছে না—তার এই অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর কর্মকে ধিক্কার দিচ্ছে, ঘৃণা করছে। যেন বলতে চাইছে, শচীন মজুমদার যাই করুক, তবু সে বাপ; কান্তির পিতৃহত্যার কোনো অধিকার

নেই। শহরের ভদ্রসমাজে কিছুদিন ঘটনাটা নিয়ে আলোড়ন চলল, তারপর কান্তি দেখল, সমাজ তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার জন্যে কোনো ভদ্রজনের সমবেদনা সহানুভূতি নেই। বাতিল হয়ে গেল কান্তি। সমাজ তাকে বাতিল করে দিল।

দশ

দেওয়ালি পেরিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছিল। শীতের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এবার যেন আগে আগেই আসছে, পৌষের আগেই পুরোপুরি এসে যাবে। টানা বর্ষার পর শরৎ-হেমন্ত মাখামাখি হয়ে ছিল কিছুদিন, তারপরই শীত। শীতের আলো রোদ শহরটাকে কতটা মনোরম করতে পারছিল বলা মুশকিল। কিন্তু শীতের ধুলো ধোঁয়া সকাল সন্ধ্যের বাতাসে জমে থাকছিল। মহুয়াবাগান কিংবা ঝিলের দিকটা অবশ্য চমৎকার হয়ে উঠেছিল, রেলের অফিসার পাড়া ঝকঝক করত রোদে, বাজারের অলিগলি ঘিঞ্জিই শুধু শীতের বাতাসে আরও ধুসর হয়ে উঠল।

মিলি মধ্যে কয়েকদিন ছিল না। বর্ধমান হয়ে কলকাতা ঘুরে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়ল খুব। বলল, আমি হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

কান্তি বুঝতে পেরেছিল, মিলি আর এ-শহরে থাকবে না। এখানকার হাসপাতালও আর মিলির পক্ষে নিরাপদ নয়। তার ওপর এখন চোখ রাখছে হাসপাতাল। একদিন রাত ডিউটিতে মিলি নেশার মধ্যে ধরাও পড়ে গেছে। তবু বাঁচোয়া, মিলি ওষুধ খেয়ে নেশা করেছিল।

শীতের মুখটা এইভাবেই কেটে গেল, ডিসেম্বর মাসে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা নামল পৌষের।

ঠান্ডা লেগে কান্তির জ্বরজ্বালা মতন হয়েছিল, সেরে ওঠার মুখে একদিন মিলি বলল, "আসছে মাসের প্রথমেই আমি চলে যাব।"

কান্তি চা খাচ্ছিল, কথাটা শুনল, কোনো জবাব দিল না।

মিলির হাতে তখনকার মতন কোনো কাজ ছিল না। সকালে ডিউটি ছিল হাসপাতালের। ফিরতে ফিরতে বেলা হয়েছিল। রান্নাবান্না সেরে খেতে খেতে দুপুর। শীতের বেলায় এত আলস্য লাগছিল যে মিলি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে উঠে সে চিঠি পেল। কলকাতা থেকে পার্বতীদি লিখেছে, তুই কলকাতায় আয়, আমি তোর জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছি। নার্সিং হোমে থাকবি আমার, আমি এখন ছুটি নেব, আটমাস চলছে, এখন আর পারছি না। আমার জায়গায় তোকে বসিয়ে ছুটি নেব। এখানে থাকতে থাকতে তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আমি করে দেব।

মিলি একটু দোনামোনার মধ্যে ছিল। কলকাতায় গিয়ে সে পার্বতীদি আর তার ডাক্তার স্বামীর নার্সিং হোম দেখে এসেছে, ওদের কাছেই উঠেছিল।

মিলি অনায়াসে সেই নার্সিং হোমে ইন চার্জ হয়ে থাকতে পারে। পার্বতীদির এখন বাচ্চা হবে। মাস চারেক অন্তত মিলির থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। তারপর কাছাকাছি মিলি একটা নার্সেস ইউনিআন খুলে নিতে পারে। আবার বর্ধমানেও মিলি তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সেখানে সে বাড়ি পাচ্ছে, দু তিনটি মেয়েও ঠিক করা আছে। মিলি কলকাতায় যেতে রাজী নয় তেমন, বর্ধমানটাই তার কাছে পছন্দ হচ্ছে। বাঁকুড়ার চেনা জানা দুজন আছে বর্ধমানে, বিশ্বাস ডাক্তার, আর হাসি।

চা শেষ করে কান্তি কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

মিলি বিছানার ওপর বসে ছিল। জানলা বন্ধ। শীতের কনকনে বাতাস আসছিল মাঝে মাঝে ফাঁক ফোকর দিয়ে। বাতিটা একবার কমে গিয়ে আবার বেড়ে উঠল, মিলি আলোর দিকে তাকাল।

কান্তি একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "আসছে মাসেই যাবে কেন,"

"আজ কলকাতা থেকে চিঠি পেয়েছি," মিলি বলল।

"ও! কলকাতাতেই যাবে?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না। বর্ধমানে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। কলকাতায় গেলে এখন পরের দায় ঘাড়ে করতে হবে।"

কান্তি কোনো কথা বলল না। মিলির চাকরি আসছে মাসেই ফুরিয়ে যাচ্ছে তাহলে?

সুতীর মোটা চাদর মিলির গায়, মাথার চুল কোনো রকমে হাতে জড়িয়ে খোঁপার মতন তুলে রেখেছে। পা তুলে বিছানায় বসে ছিল মিলি।

দুজনেই অল্প সময় কথাবার্তা বলল না। বোধহয় কিছু ভাবছিল।

শেষে মিলি হাসিমুখে বলল, "আমার মালপত্তর এবার গুছোতে শুরু করতে হয়। তুমি গুছিয়ে দেবে না?"

কান্তি ঘাড় কাত করল। "দেব।"

মিলি কান্তিকে দেখছিল। মিলি জানে, সে চলে যাচ্ছে—কান্তি এটা বুঝে নেবার পর থেকে মুষড়ে পড়েছে। আজকাল কান্তিকে বেশ মনমরা দেখায়।

কান্তির নজর পড়ল মিলি তার দিকে তাকিয়ে আছে। কান্তি বলল, "কী দেখছ?"

"কিছু না।...তুমি কি চায়ের দোকানেই থাকবে বরাবর?"

"আর কোথায় যাব?"

"তুমি বড় বোকা—" মিলি বলল, "তোমার বাবা কোনো রকমে এই ধাক্কাও সামলে উঠেছেন। এখন কিছু টাকা পয়সা যদি পেতে পারতে...কিছু একটা করতে...নয়ত এভাবে তোমার দিন কাটবে?"

কান্তি মিলির চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল। "বাবার কাছে আমি টাকা চাইব?"

"তুমি কেন চাইবে। বেচুবাবুকে বলো। তোমার বাবা ছেলেকে মাসে মাসে

হাত খরচা দিতে নিজেই যদি রাজী হয়ে থাকে, তাহলে...”

কান্তি মাথা নেড়ে মিলিকে বাধা দিল। “না; আমি টাকা নিই নি; নেব না।”

মিলি অকারণ তর্ক করল না। তার দরকার কী। কিন্তু কান্তি যে কী করবে মিলি বুঝে উঠতে পারছিল না। মিত্তিরবাবুর চায়ের দোকান, ত্রিদিবের গ্যারেজ, আর কখনো কখনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ ভাঙ খেয়ে কী তার জীবন কেটে যাবে। এভাবে কারও জীবন কাটতে পারে না; অন্তত পুরুষ মানুষের নয়। কান্তিকে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে কবে তার বাবা মারা যায় এবং মারা যাবার পর যদি বরাত জোরে কিছু পেয়ে যায়। তাও যে পাবে এমন মনে হয় না। কেননা, কান্তি এখন নিজেও বিশ্বাস করে বাবা যখন রানীকে নিয়ে একবার কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে—তখন রানীকে সইসাবুদ করে গোপনে বিয়ে করে এসেছে। বিয়েটা নিশ্চয় বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে প্রয়োজন ছিল। রানীর আমলে কান্তি একটা কানাকড়িও পাবে না। মিলি বুঝতে পারে না, কান্তির কোনো ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে কিনা! জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘কী জানি কি করব! আমি জানি না।’

সিগারেট খেতে খেতে কান্তি বলল, “তুমি বর্ধমানেই যাও।”

মিলি চোখ তুলল। “কেন?”

“তবু কাছাকাছি হবে—” কান্তি হাসল।

মিলিও হেসে বলল, “আমি বর্ধমানে গেলেই বা তোমার কি! তুমি কি রোজ সেখানে ছুটবে নাকি?”

কান্তি কিছু বলল না, হাসতে থাকল।

মিলি বলল, “তুমি কিছু একটা করো। এভাবে বসে বসে আর নেশাভাঙ করে তোমার জীবন কাটবে না। কাটবে?”

“কী করব?”

“আমি কি জানি!” মিলি বিছানার একপাশে হেলে বসল, বালিশে ভর দিল হাতের। “...তোমার বন্ধু ত্রিদিবের মোটর-কারখানাতেও তো কিছু করতে পার।”

“ত্রিদিব! ত্রিদিব ভাদুড়িকে তুমি চেন না। টাকা পয়সার ব্যাপারে ভাদুড়ির বাচ্চা খুব টাইট্। আমার টাকা থাকলে শালার সঙ্গে পার্টনারশিপ করা যেত। আমার টাকা নেই। ত্রিদিব শালা কিছু কিছু দেয়, নয়ত বিড়ি ফোঁকারও পয়সা জুটত না।”

মিলি জানে কান্তি সত্যি কথাটা বলল না। ত্রিদিব কান্তিকে মোটামুটি যুগিয়ে যায়, অন্তত আজকাল ত্রিদিবের মোটর-কারখানার কিছু কিছু কাজ কান্তি দেখে, সেটা খেয়াল এবং মরজির দেখা, ত্রিদিবও কিছু কিছু দেয় কান্তিকে। কিন্তু কান্তি ঠিক পছন্দ করে না ত্রিদিবকে—কেন করে না বলা মুশকিল। বোধ হয় ত্রিদিবের স্বভাবটভাব তার ভাল লাগে না।

কান্তি সিগারেটটা নিবিয়ে দিতে উঠল। "তুমি আমায় কিছু টাকা দাও না।"

"টাকা! আমি দেব তোমায় টাকা!"

"তুমি তো বিস্তর করেছ?"

"তা করেছি—" মিলি ঠোঁট কুঁচকে হাসল।

"না করলে নিজের বিজনেস করতে যাও," কান্তি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে একটু দাঁড়াল, তারপর বিছানার কাছে এল। "তুমি মাইরি স্বাধীন হয়ে যাচ্ছ!"

"কেন যাব না?" মিলি পা গুটিয়ে নিল, কান্তি বসবে।

কান্তি বসল। "স্বাধীন হবার জন্যে কি চাই মিলি, টাকা?"

"টাকাও চাই। আমার পিসির সেই ভাঙা বাড়িটা না বেচতে পারলে আমার কিছু হত না। ওই টাকা আমি কত কষ্টে জমিয়ে রেখেছি, একটা আধলাও কোনোদিন তুলি নি। কতদিন ধরে আমি শুধু ভেবেছি. চাকরি আর করব না, নার্সেস ইউনিয়ন করব। কী দরকার আমার চাকরির। আমার গতর আছে, খাটতে পারি, খেটে খাব। হাসপাতালের চাকরিতে ক'টাকা দেয়! কত রকম তার ধরাবাঁধা, বায়নাক্কা...এবার আর আমার কি! কারও তোয়াক্কা করতে যাচ্ছি না।"

কান্তি মিলির দিকে হেলে বসল। তারপর তার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বেঁকে উঁচু মুখে বিছানার ওপর আধশোয়া হল। হালকা গলায় বলল, "তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চল না!"

"কেন, তোমায় কেন নিয়ে যাব?"

"নিয়ে গেলে তোমার ক্ষতি কি!"

"আমার লাভটাই বা কি!"

"আমি তোমার বিজনেস দেখব।"

"তুমি নিজেরটা দেখ।"

"তুমি বড় স্বার্থপর!"

মিলি কিছু বলল না, হেসে ফেলল।

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। মিলি একটু গুছিয়ে বসল, কান্তির মাথার চুল রুক্ষ, দাড়ি কামায় নি, চোখে মুখে চুলে কেমন একটা জ্বরের গন্ধ এখনও যেন পাওয়া যায়। মিলি কান্তির চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে টানতে লাগল আস্তে আস্তে।

চোখ বুজে থাকল কান্তি। তারপর হঠাৎ বলল, "মিলি, তুমি ভাবছ—একটা নিজের মতন কিছু করতে পারলে তুমি বেঁচে যাবে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বাঁচবে না।"

"কেন?"

"কেন—তা আমি তোমায় বোঝাতে. পারব না।...ও ভাবেও বাঁচা যায় না।"

"ওভাবে যায় না তো কিভাবে যায়, তোমার মতন থাকলে?"

"না, আমার মতন থাকলেও নয়। কে তোমায় বলেছে আমি বেঁচে আছি! আমি বেঁচে নেই।" কান্তি ম্লান গলায় বলল।

"কেন, এই যে আছ—!" মিলি কেমন সন্দেহ করে তার হাতের উলটো পিঠটা কান্তির গালের ওপর রাখল।

কান্তি নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে। মিলির হাতটা টেনে নিল। "তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকলেই কি বেঁচে থাকা হয়!"

মিলির হাসি পেল। বলল, "কী করলে হয়?"

কান্তি কোনো জবাব দিল না। নীরব। খানিকটা পরে বলল, "মিলি, তুমি এসব বুঝবে না। শচীন মজুমদার মোটা ফোম গদির ওপর রানীর কোলে হাত রেখে শুয়ে আছে এখন। আমি তোমায় বলছি, গিয়ে দেখে আসতে পার! তা বলে সে বেঁচে আছে? রানী মাদী বেড়ালের মতন গা গতর ফুলিয়ে লাটের পাশে বসে আছে। সে শালী বেঁচে আছে? ত্রিদিব শালা বাড়িতে তার ছোট ভাইকে বোঝাচ্ছে, তার কারবার এবার তুলে দিতে হবে—বাজারে টাকা নেই, অথচ শালা বউয়ের নামে মহুয়াবাগানে জমি কিনেছে। ত্রিদিব শালা বেঁচে আছে?"

মিলি অধৈর্য হয়ে বলল, "সবাই মরে গেছে। সংসারটা এমনি চলছে!"

"সংসারটা যে কেমন করে চলছে তা তো দেখছ না। সংসার বেচারার না চলে উপায় নেই, নিজের মরজি থাকলে সে আর চলত না। ওর কোনো মরজি নেই, চাকার মতন গড়িয়ে দিলে চলে যায়। বুঝলে?"

"দরকার নেই আমার বুঝে।...সরো, উঠব।"

"কোথায় যাবে?"

"দরকার আছে, সরো—।"

কান্তি মাথা সরাল; মিলি উঠল, পা নামিয়ে যেন টান ভাবটা ছাড়িয়ে নিল।

মিলি উঠে যাবার পর কান্তি বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে থাকল। কেমন যেন অবসাদ অনুভব করছিল কান্তি, ভাল লাগছিল না, মিলি চলে যাবে এই চিন্তা তাকে কখনো কখনো অন্যমনস্ক বিষণ্ন করে তুললেও এখন কান্তি সে চিন্তা করছিল না, কান্তি ভাবছিল, মিলি যাকে বেঁচে যাওয়া ভাবছে—মানে দাসত্ব থেকে মুক্তি ভাবছে, স্বাধীনতা ভাবছে—সেটা না মুক্তি না স্বাধীনতা। কান্তি নিজেও কি মুক্তি চায় নি? না চাইলে কেন সে বাবাকে ঘৃণা করেছে, কেন মার ওপর তার টান জন্মায় নি, কেন রানীর ইশারা বুঝে তাকে লেপের তলায় টেনে নিয়ে শোয় নি, কেন সে বাবার পায়ে পায়ে নিজের ভাগ্য বেঁধে দিয়ে পশার জমিয়ে তোলে নি, কেন সে শচীন মজুমদারকে খুন করতে গিয়েছিল, কেন তার ইচ্ছে হয় রানীকে চৌমাথার মোড়ে এনে ন্যাংটো করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লোককে ডেকে ডেকে বলে, দেখে যান মশাইরা, খানকি মাগী কাকে বলে—দেখে যান! কে বলেছে কান্তি কিছু চায় না? কান্তি চায়, এ শালা চুতিয়া সংসারকে লাথি মেরে ভেঙে দাও। এই শালা তোমার সংসার, সমাজ?

শালা তুমি বলো তুমি রক্ষক? কী আছে তোমার? তোমার শালা জাত ধর্ম নেই, চরিত্র নেই, তোমার কাপড় সরালে দুর্গন্ধ ঘা। মাছি ভনভন করে। তুমি ফ্যান্সি কাপড় ধার করে গায়ে জড়িয়ে খানকি সেজে লোক ডাকছ! কান্তির হঠাৎ ছেলেবেলায় পড়া কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল : আয় তোরা সবে ছুটিয়া।

দমকা হাসি এল কান্তির. হো হো করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না।

মিলি ঘরে ছিল না। ফিরে এসে বলল, "কী হল, অত হাসছ কেন?"

বিছানার ওপর ছেলেমানুষের মতন গড়াগড়ি দিয়ে কান্তি বলল, "হাসলে আয়ু বাড়ে, আয়ু বাড়াচ্ছি।"

ভ্রুকুটি করে মিলি বলল, "তোমার মাথায় বেশ ছিট আছে।"

বিছানার ওপর উঠে বসল কান্তি। "তা আছে।"

মিলি দেরাজের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টানল। স্পিরিট স্টোভ জ্বালিয়ে জল বসিয়ে এসেছে, ইনজেকসানের সিরিঞ্জ-টিরিঞ্জ ফেলে দিয়ে আসবে।

"জামাটামা ছাড়বে না?" মিলি বলল।

"সব ছেড়ে ফেলব। একেবারে ল্যাংগা মহাত্মা হয়ে যাব।"

"সন্ন্যাসী হবে?" ঠাট্টা করে মিলি বলল।

"ওটাও একটা লাইন। ভাল লাইন।"

"আর কোনো লাইন নেই?"

কান্তি একটু ভেবে বলল, "আর একটা চালু লাইন আছে, দিনেশের লাইন। ওটায় আমার টেস্ট নেই।"

অন্যমনস্কভাবে মিলি একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, ইনজেকসানের জিনিস গুছিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠল কান্তি। একটা কিছু হতে পারলে ভাল হত, 'সামথিং' কিছু একটা, তাতে শালা 'বাঁচা' চলত। কিন্তু কী হল কান্তি! এই সমাজ, এই সংসার, এই জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, পাপ খেলোইয়েন নান্দিপ্রথানা-সব যদি জাহান্নমে যায়, তাহলে তারপর কী থাকল? কী সে থাকল কী যে থাকবে কান্তি কল্পনা করতে পারে না। হয়ত কিছুই থাকবে না। বা যা থাকবে--সেই অস্পষ্ট জগতকে সে ধারণা করতে পারছে না। না, কান্তির কোনো বিশ্বাস নেই, আশা নেই। হয়ত তাই কান্তি কিছুই করতে পারল না। হ্যাত্‌ ..বিল্কুল বরবাদ হয়ে গেল জীবনটা।

জামাটামা ছাড়তে ছাড়তে কান্তি ডাকল, "মিলি?"

পাশের ঘর থেকে সাড়া দিল মিলি। "শুনছি—!"

"যাবার আগে তোমায় আমি একটা ফেয়ারওয়েল দেব।"

"কী?"

"ফেয়ারওয়েল। তুমি একেবারে আকাট মুখ্যু, ফেয়ারওয়েল জান না?"

"নিজেকে দাও, আমায় দিতে হবে না।"

"আমার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, আমি নিজের স্প
রেখে যাব, শুধু তাসা পার্টির খরচাটা তুমি দিয়ে দিও।"

পাশের ঘর থেকে মিলি কোনো সাড়া দিল না।

কান্তি পাজামা পরল, গায়ে পুলওভার নেই, গেঞ্জির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। চাদরটা মিলির, সুজনির মতন দেখতে।

কলঘর থেকে ফিরে এসে কান্তি দেখল, মিলি ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসে আছে।

কান্তি বলল, "আমার কাঁধের ব্যথাটা যাচ্ছে না কেন?"

মিলি কান্তির দিকে তাকাল। "চলে যাবে। এখন ঠান্ডার সময়।"

হেসে কান্তি বলল, "সবাই এখন যাবার মুখে বলছ?"

মিলি কোনোরকম খেয়াল না করেই মাথা নাড়াল।

চুলটুল আঁচড়ালো না কান্তি, মুখটা মুছে নিল।

"খেয়ে নাও," মিলি বলল, "রাত হচ্ছে!"

"কত?" কান্তি দেরাজের মাথায় ছোট টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকাল

"শীতের দিন; বড় ঠান্ডা। আর ভাল লাগছে না...।"

"চলো তাহলে...!"

শীতের রাত আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। পাড়াটা প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে গলিতে তেমন সাড়া শব্দ নেই, কদাচিৎ একটা রিকশা যাচ্ছে, কারও গলার শব্দ পাওয়া গেল, আবার চুপচাপ; এত রাত্রে মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন চলে যাবার শব্দ পাওয়া গেল যেন, বাজারের দিক থেকে হল্লা উঠেছিল বোধ হয়, হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মিলি ইনজেকসানের সব কিছু গুছিয়ে ওষুধ ভরে নিল। কান্তি বিছানায় বসে ছিল। দেখছিল মিলিকে।

এগিয়ে এল মিলি। "কই দেখি—?"

কান্তি হাত বাড়িয়ে দিল। ইনজেকসানের দিকে সে তাকাচ্ছিল না, স্থির দৃষ্টিতে মিলির মুখ দেখছিল।

কান্তির হাতে তুলো ঘষল মিলি। দু মুহূর্ত অপেক্ষা করে সিরিঞ্জের ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। কান্তি তখনও মিলির মুখ দেখছে।

ছুঁচ উঠিয়ে নিল মিলি। হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত তারপর সরে এল। তফাতে গেল না, বিছানার একপাশে বসল। একেবারে ধার ঘেঁষে।

মিলি মেঝেতে পা ছড়িয়ে কাপড় উঠিয়ে নিচ্ছিল, কান্তি হঠাৎ বলল, "দেখি—!" বলে হাত বাড়াল।

অবাক চোখে তাকাল মিলি। "কী?"

৫৮। ওটা একবার দাও—।" কান্তি সিরিঞ্জটা চাইল।
এ কি করবে?"
।, দেখব।"
-১ হবে না—" মিলি বিছানার ওপর ফেলে রাখা তুলোর টুকরোটা
ুতে ঘষতে যাচ্ছিল।
৷ হাত বাড়িয়ে মিলির কনুই ধরল। "ওটা দাও।"
৷ কিছু বুঝতে না পারলেও সন্দেহের চোখে কান্তির দিকে তাকাল।
েব? কম দিয়েছি কি না।"

।ম আমায় এত অবিশ্বাস করো?" বিরক্ত হল মিলি।
অবিশ্বাস করছি না। তুমি দাও।"
"ছেলেমানুষি করো না, হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যাবে। আমার কাছে আর ওষুধ নেই।"
ভাঙব না। তুমি দাও।" কান্তি মিলির হাত টেনে নিয়েছিল। মিলি জোর 'হাত টানতে পারছিল না, সিরিঞ্জটা পড়ে যেতে পারে, ছুঁচটা বেকায়দায় । যেতে পারে।
কান্তির মুখ শান্ত, অথচ তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার জেদ সে ভাঙবে না; সিরিঞ্জটা নেবেই।
বিরক্ত, অসন্তুষ্ট হয়ে মিলি সিরিঞ্জটা দিল।
কান্তি সিরিঞ্জ নিয়ে একবার দেখে নিল। তারপর সহজ শান্ত গলায় বলল, এসো, আমি তোমায় দিয়ে দি।"
মিলি যেন চমকে উঠল। "তুমি দিয়ে দেবে কি! না, না—তোমায় দিতে হবে না।"
"কেন?"
"তুমি পারবে না।"
"পারব।"
মিলি পায়ের কাপড় নামিয়ে দিল। তার চোখে মুখে হতচকিত ভাব, শঙ্কা, অসহিষ্ণুতা। মাথা নেড়ে মিলি বলল, "পাগলামি করো না। দেব বললেই ইনজেকসান দেওয়া যায় না। তুমি জান ইনজেকসান দিতে? জান না। একটু ভুল করলে আমি মরে যেতে পারি..."
"আমি ঠিক দিয়ে দেব। রোজ দেখছি...। লাগলে তুমি বলো।"
"না। তোমার খেপামি রাখো।"
কান্তি কেমন এক মুখ করে যেন হাসবার চেষ্টা করল। "এতদিন তুমি এখন দিয়েছ আমি তো অবিশ্বাস করি নি।"
এই পাগলামি মিলির ভাল লাগছিল না। মিলি বলল, "তুমি ইনজেকসান দিতে জানো না; আমি জানি। তাছাড়া ওটা বিষ।"

কান্তি যেন কথাটা শুনতে পেল না। তার মুখ
অথচ তার ঠোঁট সামান্য কাঁপছিল, চোয়ালের ওপর
চোখে, পাতা নড়ছিল না, যেন মিলির চোখের ত
দিকে সে তাকিয়ে আছে।

কেমন এক ভয় হল মিলির, অদ্ভুত ভয়; বিশা
ওপর ছড়িয়ে এল, বুক বড় ভারী লাগছিল। মি
বোধহীন হয়ে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ বাঁ হাত

কান্তি আঙুলের ইশারায় শাড়ি জামা সর।

মিলি গায়ের চাদর আগেই খুলে রেখেছিল।
গায়ের জামাটা আঁট। হাতের কাপড় টেনে তুলে দি।

কান্তি তুলো ঘষে দিল মিলির বাহুতে। তার হাত ক।

মিলি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি যদি মরি তোমায়

কান্তি বলল, "তোমায় আমি মারব না। তোমায় মেরে আ
এদিকে তাকাও। দেখো।...লাগলে বলো।"

মিলি তাকাল না। যেন কান্তির দেওয়া এই বিষে সে মর
নিয়ে তার উপায় নেই।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে একসময় কান্তি ডাকল, "মিলি?"

মিলি সাড়া দিল না।

কান্তি হাত বাড়িয়ে মিলির পিঠের ওপর রাখল।

"এই মিলি?" কান্তি তার পা মিলির পায়ের ওপর রাখল। "তুমি কথা বলছ না কেন?"

মিলি কোনো সাড়া দিল না। অথচ সে কাঁপছিল।

নেশার ঝিম লাগছিল কান্তির। হাত বাড়িয়ে মিলির মুখ খুঁজতে গিয়ে অনুভব করল, মিলির নিশ্বাস বড় গরম, মিলির চোখে গালে জল, মিলি ঠোঁট-মুখে লালা জড়ানো।

কান্তি হঠাৎ বলল, "তোমার যাবার দিন আমি তোমার সব গুছিয়ে দেব।"

মিলি অনেকক্ষণ কোনা কথা বলল না, শেষে জড়ানো গলায় বলল, "দিও।"

॥ সমাপ্ত ॥